উত্তরাখন্ড

- তপন কুমার রায়

গত দু'হপ্তা খবরের কাগজ আর টিভি খুললে প্রধান খবর দেখছি উত্তরাখন্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় । এককালে এই অঞ্চলটি উত্তর প্রদেশের অংশ ছিল । হিমালয়ের এই অংশটি চিরকাল গাড়োয়াল আর কুমায়ুন অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত । সম্ভবত দুহাজার সালে আলাদা রাজ্য হয়ে প্রথমে উত্তরাঞ্চল ও পরে নাম পাল্টে উত্তরাখন্ড হল ।

এই বিপর্যয়ের পর জানিনা শেষ পর্যন্ত কত হাজার মানুষ প্রাণ হারাবেন । কত শিশু পিতৃ-মাতৃ হারা হবে, কত মা-বাবা সন্তান শোকে কাতর হবেন । ছবিতে দেখছি কত বাড়ী ঘরদোর নদীর জলে ভেসে গেল । প্রকৃতির এই তাণ্ডব লীলার জেরে এখনও কত মানুষ নিখোঁজ । জানিনা কোনদিন তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাবে কি না ।

হিমালয়ের অন্যান্য জায়গার মধ্যে এই অঞ্চলটি আমার বিশেষ প্রিয় । আর পাঁচটা শৈল শহরের সঙ্গে এখানকার জনপদগুলো চরিত্রগত ভাবে একেবারে আলাদা । পূব দিকে দার্জিলিং, কালিম্পঙ বা উত্তরে সিমলা, নৈনিতাল ইত্যাদি যেগুলো সাহেবদের তৈরি, সেই সব জায়গার সঙ্গে কোন পৌরাণিক কিংবদন্তী জড়িয়ে নেই । সাধারণভাবে ওগুলো সৃষ্টির কারণ মূখ্যত বাণিজ্যিক । এই শহরগুলো কয়েক দিনের হাওয়া বদল বা সম্পূর্ণ বিশ্রামের পক্ষে একেবারে আদর্শ । এই সব শহরে বড় বড় হোটেল প্রচুর থাকলেও দুটো একটা ছোটখাট মন্দির বাদ দিলে ঠিক যে অর্থে আমরা তীর্থস্থান বলি সেরকম কোন মন্দির নেই । ভ্রমণসঙ্গীর মানচিত্রে এখানকার আবহাওয়া এবং আরামের অনেক রকমের বর্ণনা পাওয়া যায় ।

গাড়োয়াল বা কুমায়ুন অঞ্চল কিন্তু এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই অঞ্চলটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রামায়ন মহাভারতের কাহিনী এবং উপনিষদের বাণী । হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের মুনি ঋষিরা এই জায়গাতে সাধনা করেছেন । এই সব দূর্গম পাহাড়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত প্রায় ছিল না বললেই চলে । প্রথম যৌবনে রাজা রামমোহন রায় প্রায় হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করেন । উপনিষদের বাণী তাঁকে এই জায়গাতেই উদ্বুদ্ধ করে । সেই সময় বহু যাত্রী এই সব শ্বাপদ সংকুল জায়গায় তীর্থ ভ্রমণে এসে প্রাণ হারাতেন । স্বর্গীয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি বেশ উপভোগ্য ভ্রমণ কাহিনী আছে । প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'ও একটি জনপ্রিয় উপন্যাস । ওটি এখানকার পটভূমিতে লেখা । পরবর্তীকালে এটির ওপর একটি সিনেমাও বেশ জনপ্রিয় হয় । ওদের লেখা থেকে জানা যায় যে সে সময় যাত্রীদের রাত্রিবাসের একমাত্র জায়গা ছিল রাস্তার ধারের চটি । পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় কালীকমলির চটি তীর্থযাত্রীদের খুব প্রিয় জায়গা ছিল । পায়ে হাঁটা পাকদন্ডি দিয়ে যেতে হত । নদী পার হবার উপায় ছিল কিছু দড়ির তৈরি সাঁকো । সাধু সন্ন্যাসীদের বাস ছিল দূর্গম পাহাড়ের গুহার মধ্যে । চাষ আবাদ বলতে সামান্য কিছু জমিতে চাল গম ছাড়া ভূট্টা ইত্যাদি । রাতের অন্ধকার ছাড়াও ভর দুপুরে পর্যন্ত বাঘ ছাড়াও নানারকমের হিংস্র প্রাণীর অবাধ যাতায়াত । সাধুরা আশ্রমে গরু, ভেড়া পালন করতেন । মালপত্তর পরিবহনের জন্য খচ্চর ছিল একমাত্র ভরসা । এক কথায় মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল ভগবানে অগাধ বিশ্বাস । গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জিম করবেট সাহেব এখানে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন কুমায়ুন অঞ্চলে একটা মানুষখেকো বাঘকে মেরেছিলেন বলে । রুদ্রপ্রয়াগে সেই জায়গাতে এখন একটা সাইনবোর্ড দিয়ে চিহ্নিত করা আছে । ওই বাঘটিকে মারার পর করবেট সাহেবকে স্থানীয় মানুষজন প্রায় ভগবানের মত মানতো ।

সাম্প্রতিক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মনটা স্বাভাবিক ভাবেই খুব খারাপ হয়ে গেল । মনে পড়ে গেল আমাদের ১৯৮৯ সালের অক্টোবার মাসে প্রথম কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ভ্রমণের কথা । দেরাজ হাতড়ে পুরোনো দুটো এ্যালবামের সন্ধান পেলাম সঙ্গে আমার লেখা কিছু নোটস্ । তখন আমাদের দেশে ডিজিটাল ছবির প্রচলন হয়নি । দুটো এ্যালবামে অনেক ছবি । আমাদের ছেলে মেয়েও সেসময় বেশ ছোট । আমাদের ছেলে মেয়ে ছাড়া আমাদের যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু খোকা, তার স্ত্রী শ্বেতা ও আমার স্ত্রী পম্পার বাবা মা । হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী । এক রাত্রি দিল্লীতে রাত্রিবাস । পরের দিন সকালে বেরিয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেল হৃষিকেশ পৌঁছতে ।

গাড়োয়াল ট্যুরিজমের মানুষজন খুব আদর আপ্যায়ন করে ওদের মুনি-কি-রেতির পান্থশালায় থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন । পুরো যাত্রাটাই ওদের বিশেষ প্যাকেজ । আমাদের সঙ্গে আরো প্রায় জনা বারো যাত্রী । একটি মিনি বাসের মত যান আমাদের জন্য এই ক'দিন বরাদ্দ । ড্রাইভার আর সহকারী ছাড়াও একজন গাইড আমাদের সঙ্গী । গাইড ভদ্রলোকের নাম কোঠিয়াল । দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর বাস ছাড়লো । ঘণ্টা দুয়েক পর দেবপ্রয়াগ । এখানে দেবপ্রয়াগে ওদের যাত্রীনিবাসে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ।

ভোর বেলা আমরা অলকানন্দা আর ভাগীরথীর সঙ্গম রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে দেখতে গেলাম । অত নিচে নামতে হবে বলে দু'একজন বাদে অনেকেই ওখানে এলেন না । অলকানন্দা শান্ত ধীর আর নীল । তার পাশ দিয়ে ভাগীরথী দাপিয়ে কাঁপিয়ে এসে মিলিত হয়ে নাম নিল গঙ্গা । এই নাম নিয়েই গঙ্গা এখান থেকে বহু জনপদ পার হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গাসাগর নাম নিয়েছে । লোহার চেন ধরে গাইডের তত্ত্বাবধানে আমি জলে নামলাম ঠিক যেন বরফ গলা জলে ডুব দিলাম । সকালের জলখাবার খেয়ে রওনা । সোজা শ্রীনগর । এটি ছিল গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী । ছোট্ট বসতি । ওখানে ওদের একটা যাত্রীনিবাসে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার যাত্রা । বিকেল বিকেল গুপ্তকাশীতে চা খাবার বিরতি । মহাভারতের শেষ পর্যায়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পান্ডবরা কাশী-বেনারসে শিবের আশীর্ব্বাদ চাইতে গেলে শিব প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে এই গুপ্তকাশীতে চলে আসেন । সেই কারণে এই জায়গার এরকম নামকরণ । চায়ের পর সোজা শোনপ্রয়াগ । এখানকার যাত্রীনিবাসটি একটা টেন্ট কলোনী । এটি ফাইবার গ্লাসের তৈরি । সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে জেনারেটর বন্ধ হলে আলো নিভে যায় । কাজেই খাওয়া দাওয়া সব তার মধ্যে সেরে নিতে হল । জায়গাটা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে । বাসুকিতাল থেকে শোন গঙ্গা এখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিশেছে । সেজন্যে এই প্রয়াগের নামকরণ শোনপ্রয়াগ । এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ত্রিযুগী নারায়ন, যেখানে শিব পার্ব্বতীর বিয়ে হয়েছিল । নিবাসের বাইরে সুন্দর একটা বাগান । সকালে ওখানেই মিষ্টিরোদে বসে চা জলখাবার খাওয়া । আটটা নাগাদ আবার রওনা হয়ে সোজা গৌরীকুন্ড । এর পর কেদারের পথে আর গাড়ির রাস্তা নেই । গাইড বলে দিয়েছিল এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না । বয়স্কদের আর আমাদের ন'বছরের ছেলের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা । বাকী আমরা সবাই একটা করে লাঠি নিয়ে রামবাড়া হয়ে চোদ্দ কিলোমিটার হেঁটে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওঠার প্রস্তুতি নিলাম । সঙ্গে একজন পোর্টার আমাদের রুকস্যাকগুলো নিয়ে হাঁটা লাগালো । ওর নাম ছিল নেগী । গাইড বলে দিল ঠিকঠাক হাঁটলে বিকেল হবার আগেই কেদারনাথ পৌছনোর কথা । পই পই করে বলে দিল রামবাড়াতে কিছু খেলেও একেবারেই সময় নষ্ট করবেন না । সঙ্গে কিছু লজেন্স আর বাদাম-আখরোট ওদের কথা মত নিয়ে এসেছিলাম । রামবাড়া পর্যন্ত কিছু বুঝিনি । তার পর রাস্তা প্রচণ্ড খাড়াই আর ভাঙ্গাচোরা । রাস্তার এক ধারে খাড়া পাহাড়, আরেক ধারে অলকানন্দা ভ্যালী । কোথাও কোথাও দূরে ঝর্ণা দেখা যাচ্ছিল যার মধ্যে কয়েকটা আবার জমে বরফ হয়ে ঝুলছিল । আকাশের হাল্কা মেঘ সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল । আমাদের পোর্টার নেগী চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল পা চালাতে । বলে নিজে একটা পাকদন্ডী দিয়ে উঠে সর সর করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল । আমাদের বাসের সহযাত্রীদের মধ্যে গুজরাট থেকে আসা বয়স্ক এক দম্পতি ছিলেন । তাঁরাও আমাদের থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন । হঠাৎ মনের কোণে একটু ভয় দেখা দিল । সন্ধ্যে নামার আগে যে ভাবেই হোক ওপরে পৌঁছতে হবে । দেখতে দেখতে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে হাওয়া আর তার সঙ্গে বরফের কুচির মত ছোট ছোট কি যেন ! খেয়াল করলাম আমাদের রেনকোট ইত্যাদি সব নেগীর সঙ্গে এতক্ষণে কেদারনাথের হাওয়া খাচ্ছে । পেছন থেকে কয়েকজন যাত্রী ঘোড়ায় চড়ে আসছিল । ওদের এক সহিসের কথা মতো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সবাই বসে পড়লাম । অদ্ভুতভাবে ওই ঝড় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল । আমরাও জোর কদমে পা চালিয়ে সন্ধ্যের আগেই কেদারনাথ পৌঁছে গেলাম । ভাবতে অবাক হয়ে যাই এত সবের পরেও আমাদের কারো এতটুকু ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্নমাত্র ছিল না । আমরা নিগমের পান্থশালায় না থেকে মন্দিরের সামনেই একটা বেসকারি লজে ঠাঁই নিলাম । লজের পরিচালক জানিয়ে দিল খিচুড়ি ছাড়া আর কিছু খেতে দিতে অপারগ । সন্ধ্যে সাড়ে ৭টার আগেই গরম খিচুড়ি যেন অমৃত মনে

হোল । প্রচণ্ড ঠান্ডায় যার যা গরম কাপড় ছিল পরে সোজা লেপ-কম্বলের তলায় । অক্সিজেন কম থাকার দরুণ পরিচারক মশাই ঘর থেকে লোহার পাত্রে কাঠ কয়লার আগুনটাও সরিয়ে নিয়ে গেল । তাপমান শূন্যের নিচেই ছিল বলেই অনুমান ।

সকাল বেলা মন্দিরে পুজো দিয়ে চার পাশে ঘুরে দেখলাম । মূল মন্দিরের চাতাল জমি থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয় । ভেতরে একটি কাল রঙের পাথর ওটাই শিবের মূর্তি । কপ্পুর আর ধুপের গন্ধে ভেতরের আবহাওয়া মনে অদ্ভুত একটা সাত্ত্বিক ভাব এনে দিল । মন্দিরের বাইরে একটু তফাতে আদিগুরু শঙ্করাচার্যের সমাধি । সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে অদ্বৈত বেদান্তবাদীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম । মাত্র ওই বয়েসে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি ধাম প্রতিষ্ঠা করে এই জায়গায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন । মন্দিরের পেছনে বরফে ঢাকা মন্দাকিনী হিমপ্রবাহের বিশাল চূড়া মনটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায় । চারিদিকের দৃশ্য যেন সত্যি কোন স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা । যতটা সম্ভব ক্যামেরা বন্দী করার অপচেষ্টা । মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ছেলেকে নিয়ে ছবি তুললাম । এই জায়গাতেই শিব গুপ্তকাশী থেকে পালিয়ে এসে লুকোবার চেষ্টা করে অসফল হয়ে ছিলেন । মাটির তলায় লুকোতে গিয়ে শিবের পিঠের অংশটুকু দেখা যায় । শিবের অন্যান্য মন্দির থেকে এখানে তফাৎ হল এখানে জল বা দুধ ঢালা হয় না । ঘি ব্যবহার হয় বেশী । পূজারী ও পান্ডারা অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র । ভক্তদের ওপর কোনরকম চাপ নেই । যার যা খুশী দক্ষিণা দিতে পারেন । এমন কি কিছু না দিলেও কোন আপত্তি নেই । হয়তো স্থান মাহাত্ম ! একটু দূরে বাসুকিতাল যাওয়ার সময় নেই । গাইডের তাড়ায় বেলা দশটার মধ্যে নামা শুরু ।

গৌরীকুন্ড পৌঁছতে বেশী সময় লাগলো না । বিকেল বিকেল বাস ছেড়ে সন্ধ্যের মুখে মন্দাকিনীর ধারে চন্দ্রপুরা নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম । এখানে কোন পাকা বাড়ী নেই । কাপড়ের টেন্টে দুটো করে খাট । খাবার জায়গা এবং বাথরুম সবই টেন্টের । খাওয়া হয়ে গেলে ছোটরা আর বয়স্করা শুতে চলে গেল । আমরা ক'জন বাইরে মন্দাকিনীর ধারে চাঁদের আলোর বন্যা দেখছিলাম । একটানা ঝর্ ঝর্ করে স্রোতের আওয়াজ । নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে একেকটা বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছিল । জলের ফেনার অপর চাঁদের আলো হীরের টুকরোর মত দেখাচ্ছিল । লজের পরিচারকের গলা, সাব আপলোগ টেন্টকা অন্দর যাইয়ে । বাহার মে শূয়ার নিকাল সকতা । টেন্টকা রসি টাইট করকে বাঁধনা' । টেন্টের ভেতরে একটা করে হ্যারিকেনের আলো । বাইরে দু একটা হ্যাজাক লাইট । লণ্ঠনের শিখা একটু কমিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে চোখে পড়লো টেন্টের একেবারে চূড়োয় প্রায় ফুট খানেক ব্যাসার্দ্ধের একটি মাকড়সা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে । শূয়রের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে কম ক্ষতিকারক বিবেচনা করে বালিশের পাশে টর্চটি রেখে ঘুম ।

ভোরবেলায় গাইডের গলার আওয়াজ, 'ব্রেকফাস্ট কে বাদ হমলোগ সিধা বদ্রীনাথ চলেঙ্গে । সাত ঘন্টা কা রাস্তা' । বাস এঁকে বেঁকে চললো । মন্দাকিনীকে কখনও বাঁয়ে কখনও বা ডাইনে রেখে আমাদের বাস রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত নামবে ওখানে মন্দাকিনী অলকানন্দার সাথে মিলিত হয়ে নিজের পরিচয় হারাবে । এখানকার উচ্চতা প্রায় দু'হাজার ফুট ।

তারপর থেকে অলকানন্দার ধার দিয়ে চড়াই । বাস রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে গোউচর, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, চামোলি, পিপলকোট ছেড়ে গৌরগঙ্গা নামে একটা ছোট্ট শহরে দাঁড়ালো । সাইনবোর্ড জানাল এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে । মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে বাস আবার রওনা দিল যোশীমঠের দিকে । যোশীমঠের উচ্চতা ছ'হাজার দু'শ ফুট ।

এখান থেকে বদ্রীনাথের পথ অপ্রশস্ত । কাজেই যান এখানে একমুখী । যান চলাচলের নির্দ্দেশ পুরোপুরি মিলিটারীর হাতে । একে স্থানীয় ভাষায় বলে 'গেট' পদ্ধতি । আমাদের গাইড বাবু জানালেন এখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে হবে । তার আগে যোশীমঠ ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন ।

আদিগুরু শঙ্করাচার্য এখানেই একটি গুহার মধ্যে সাধনা করেছিলেন এবং শঙ্করভাষ্য উনি এখানে বসেই লিখেছিলেন । গুহাটির ওপর কল্পবৃক্ষ যেটি এদের মতে দু'হাজার চারশ বছরের পুরোনো । কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ যেমন বোধগয়াতে বোধিবৃক্ষের নিচে নির্ব্বাণ লাভ করেন, আদিগুরুও এই গাছের তলায় বসে ভগবৎ দর্শন করেন । এই কারণে এই জায়গার আরেকটি নাম জ্যোর্তিমঠ । আশ্রম চত্তর ঘুরে দেখলাম । এখান থেকে অদূরে বদ্রীনাথ ধাম হল ওনার প্রতিষ্ঠিত চার ধামের একটি । উনি ভারতের চার কোণে চারটি ধাম ও চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

বেলা আড়াইটা নাগাদ গেট খুলতে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল । পথের অপূর্ব্ব দৃশ্য । ওই রকম বিপদসঙ্কুল রাস্তায় ভয় মনে ঢুকতে দেয় না । রাস্তা এক এক জায়গায় বেশ সরু । মাঝে দু এক জায়গায় ধার থেকে ঝর্ণা রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে । পাহাড়ের পাথর কেটে হিন্দিতে সাবধান বাণী 'ব্রেককা দাবা মত কিজিয়ে'। ড্রাইভার বেশীর ভাগ সময়ে সেকেন্ড বা ফার্স্ট গীয়ারে গাড়ী চালাচ্ছিল । বাসের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতা । এই ভাবে ঘন্টা দুয়েকের একটু বেশী চলার পর সামনে সমতল ভূমি । আমাদের গাইড নেগী বলে উঠলো 'জয় বদ্রীবিশাল কি জয়' । সমস্ত যাত্রী একসঙ্গে বললো জয় বদ্রীবিশাল কি জয় । কতটা ভক্তিতে আর কতটা নিশ্চিন্ততায় বোঝা গেল না ।

গাইড আমাদের যাত্রীনিবাসের ঘর ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে পরের দিনের সূচি বলে দিল । বেলা আড়াইটার গেট নিতে হবে । সেই মত সবাই যেন তৈরী হন । এখানকার উচ্চতা দশ হাজার দু'শ ফুটের কিছু বেশী । প্রচন্ড ঠাণ্ডা এবং বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বেশ মালুম দিচ্ছিল । একটু জোরে হাঁটাহাঁটি করলে নিঃশ্বাস নিতে সামান্য হলেও অসুবিধে হচ্ছিল ।

বদ্রীনাথ হল বিষ্ণুর আরেক নাম । এই জায়গার সঙ্গেও অনেক রকম পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে । অলকানন্দার ওপর একটা ছোট সাঁকো পেরিয়ে মূল মন্দিরে যেতে হয় । রাস্তার দু ধারে ছোট ছোট দোকান তাদের পসরা সাজিয়ে বসে আছে । দূর থেকে মাইকে ভজন গানের আওয়াজ । একটি বালখিল্য আমাদের বলে গেল সে হোটেলে গরম জলের বন্দোবস্ত করতে পারে প্রতি বালতি তিন টাকার বিনিময়ে । ও এই পরিষেবা রাত তিনটের থেকে শুরু করে । অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম । এইটুকু বয়সে লেখাপড়া আর খেলার সময়ে ও কি কাজ করছে !

কথামত আমাকে ভোর চারটের সময় জল পৌঁছে দিয়ে গেল । খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের দৃশ্য সূর্য ওঠার সময় দেখার মত । ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হলাম । এক মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলাম । প্রথমে লাল, তারপর ক্রমশ রঙ পাল্টে ঠিক যেন একটা বিরাট রূপোর পাহাড় আমার সামনে ! আমার ছবি তোলা শেষ হলে সবাই মিলে মন্দিরের দিকে গেলাম । প্রায় দু হাজার বছরের পুরোনো মন্দিরের সামনে মাথা এমনিতেই নিচু হয়ে আসে । আমার আগে কত মানুষের পদচিহ্ন এই মাটিতে পড়েছে । আগেকার পড়া ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম । সেদিনটা ছিল শারদীয়া দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথি । মন্দিরের গায়ে উষ্ণকুন্ড । তার ধারে অনেকে পূর্বপুরুষের পিন্ডদান করতে এসেছিলেন । সারা ভারত থেকে কত রকমের মানুষ এখানে এসেছেন । তাদের ভাষা পোষাক খাবার সব আলাদা হলেও, এখানে যেন এক সুরে সবাই ভাবছেন । কি বিচিত্র আমাদের এই ভারতবর্ষ !

মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে মানা গ্রাম, ভারতের শেষ গ্রাম । ওখানে সরস্বতী নদীর উৎস । গ্রাম পেরোলেই তিব্বত চীন । ওখানে একটা গুহায় বসে গণেশ নাকি ব্যাসদেবের মহাভারত ডিক্টেশান নিয়েছিলেন । এই সব পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়ানো এখানকার প্রতিটি মন্দির এবং গুহা ।

এবার আমাদের ফিরবার প্রস্তুতি । এখান থেকে এক রাত কর্ণপ্রয়াগে থেকে পরের দিন আবার হৃষিকেশ ।

আজ পুরোনো সেই ছবি আর স্মৃতি ম্লান হয়ে যাচ্ছে আজকের এই প্রকৃতির ভীষণ তান্ডবের কাছে । ভাবতেই পারছি না যে কেদারের পথে সেই রামবাড়া গ্রামের আজ কোন অস্তিত্ব নেই । বদ্রীনাথ থেকে ফেরার সময় গোবিন্দঘাটে আমরা খানিকক্ষণ থেমেছিলাম । সেখান থেকে হেমকুন্ড, শিখদের একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান । অলকানন্দা জলের তোড়ে সেই জায়গাটা এখন প্রায় নেই বললেই চলে ।

হিমালয়ের হিমপ্রবাহ কি কিছু বছর পর পর এই ভাবেই নিজেকে নতুন ভাবে তৈরি করে ? আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস নদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ'? উত্তরে উনি শুনতেন 'মহাদেবের জটা হইতে'। অব্যক্ত কাব্যগ্রন্থে উনি এই রকম অনেক দুরূহ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলেন ।

আমিও আজ কলকাতায় জুলাই মাসের চার তারিখে খবরের কাগজ আর টেলিভিশান বন্ধ করে চব্বিশ বছর আগেকার স্মৃতি রোমন্থন করছি । ■

বৃষ্টি ! বৃষ্টি !

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে । সেই যে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, আজও তার বিরাম নেই । সারা বিশ্ব বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । বিছানায় শুয়ে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির তাণ্ডব দেখছিল নয়না । বৃষ্টি তার বড় প্রিয় । ভীষণ ভাল লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে । কত রকমের ছন্দ তার । কখনও ঝর্‌ঝর্‌, কখনও ঝম্‌ঝম্‌, কখনও বা টাপুর টুপুর, না কি টুপুর টুপুর । আবার কখনও ঝিরিঝিরি, রিম্‌ঝিম, রিমিকি ঝিমিকি ছন্দে । ঠিক যেন নাচের ছন্দ । একে ভাল না বেসে পারা যায় ? কিন্তু তার প্রিয় বৃষ্টির এ কী রূপ আজ ? কোথায় গেল তার সেই ছন্দ ? এ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টায় । নয়নাদের সাবেকী আমলের বাড়ীর বড় বড় কাঁচের জানালা । মনে হচ্ছে এই বুঝি সব কাঁচগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে । জানালার কাঁচ বেয়ে শুধুই জলের তোড় । বাইরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না । নয়না একবার ভাবে উঠে গিয়ে কাঠের পাল্লাগুলি টেনে জানালা বন্ধ করে দেবে । কিন্তু কিছুটা আলসেমী, আবার কিছুটা প্রিয় বৃষ্টির এই অচেনা ভয়ঙ্কর রূপ দেখার গোপন ইচ্ছাটাও তাকে উঠতে দেয় নি । বৃষ্টির নানান রূপ সে দেখেছে । তবে আজকের মতন আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না তার । অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে । ভুলে যায় যে গান ছাড়া তার দিন চলে না । সেই প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত আজ আর চালানো হয় নি । তার ঘরে সব সময় সঙ্গীতের রেশ । গান ছাড়া সে থাকতে পারে না । আজ তার প্রিয় বৃষ্টির এই অপ্রত্যাশিত রূপ সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে । বৃষ্টির এই ভয়াবহ রূপ কি তাকে বৃষ্টির প্রতি বিরূপ করে তুলবে ? না, তা হবার নয় । তাহলে সেই ইউনিভার্সিটির সময়ের দুর্ঘটনা অনেক দিন আগেই তা করতে পারতো । সেও তো এই বৃষ্টিরই জন্যে ঘটেছিল । অনেক কষ্টে প্রাণে বেঁচেছিল তারা ক'জন বন্ধু । সেকথা মনে পড়লে আজও শিউরে ওঠে নয়না । সেদিন আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ হাতে নিয়ে চলেছিল তারা কিন্তু তাই বলে বৃষ্টির উপরে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি সে । তার এই বৃষ্টি-প্রেমের জন্য ছোটবেলা থেকে তাকে প্রচুর উত্যক্ত করেছে ভাই বোন ও বন্ধুরা । কারণে-অকারণে পিছনে লেগেছে । এমন কি গুরুজনেরাও তবে কারুর কোনও কথাই তার মনে দাগ কাটেনি । সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি রয়ে গেছে সে- বৃষ্টি বিলাসে মগ্ন । কবে থেকে তার এই বৃষ্টি প্রেম ? ভাবতে চেষ্টা করে নয়না । বাবা কাজ করতেন রেলে । বদলীর চাকরী । সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে নানান শহরে ঘুরেছে তারা । মা সব সময় সতর্ক থাকতেন ছেলে মেয়েরা যেন বাংলা ভুলে না যায় । তাই কত রকমের বাংলা বই কিনতেন সুযোগ পেলেই । ওরা যখন নিজেরা পড়তে পারতো না তখন মা পড়ে শোনাতেন ওদের । আর সেসব বেশীর ভাগই ছিল রবিঠাকুরের লেখা । মা ছিলেন রবি ঠাকুরের ভক্ত । রবি-প্রেম সে মার কাছ থেকেই পেয়েছে । আর ছিল নানা রকম আত্মকাহিনী । পরে যখন সে নিজে পড়তে শুরু করলো তখন অন্যান্য লেখার থেকে রবিঠাকুরের কবিতা বেশী আকর্ষণ করতো তাকে – বিশেষ করে বর্ষার । আর গান তো ছিলই । মা ভাল গাইতেন । নয়না আর তার ভাই বোনেদের হাতেখড়ি তাঁর কাছেই । একটা শহরের কথা তার খুব মনে পড়ে । নামটা মনে নেই আজ । সেখানকার রেল কলোনীটা বেশ বড় ছিল । সেখানে সব অফিসারদের বাড়ীর সামনে ছিল বাগান আর ভেতরের দিকে বড় একটা বাঁধানো উঠোন । বৃষ্টি নামলে সেখানে ওরা ভাই বোনেরা হুটোপাটি করে খেলতো । কখনও কখনও বন্ধুরাও এসে যোগ দিত । এই বৃষ্টিতে ভেজা নিয়ে কোনোদিন বড়রা কেউ রাগ করেন নি বা বাধা দেন নি । ওর বৃষ্টি প্রেম সেই তখন থেকে শুরু । নাকি আরও আগে থেকে ? যখন অনেক ছোট ছিল, মার মুখে গল্প আর গান শুনতো, তখন থেকে কি ? কে জানে ।

স্কুল কলেজে বৃষ্টি নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছে বন্ধুরা মিলে । ছুটি পাবার আশায় ইচ্ছা করে ভিজেছে । ছুটি পেয়ে নাচতে নাচতে আরও ভিজে বাড়ী ফিরেছে । একটা হাল্কা হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার মুখে । মনে পড়ে যায় শেষের দিকে ওদের দুষ্টুমি ধরা পড়ে যায় । কত স্মৃতিই ফিরে ফিরে আসে এই বৃষ্টিকে উপলক্ষ করে । বেশ লাগে তার নিজেকে ভাসিয়ে দিতে সেখানে । কতক্ষণ মগ্ন ছিল নয়না জানেনা । হঠাৎই সারা আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে । আর সেইসঙ্গে ভীষণ শব্দে বাজ পড়ার আওয়াজে চম্‌কে ধড়্‌মড়্‌ করে বিছানায় উঠে বসে সে । কাছাকাছি কোথাও পড়েছে নিশ্চয়ই । কিন্তু ওর মনে হোল যেন ওর মাথার উপরেই এসে পড়লো । আর তখনই মিষ্টি একটা বাজনার সুরে দেওয়াল ঘড়িটা জানিয়ে দিল ওর ওঠার সময় হয়েছে আর বৃষ্টি নিয়ে বিলাসিতা করার সময় নেই । অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃষ্টির কাছে মনটাকে ফেলে রেখে অলস পায়ে হাঁটতে শুরু করে নয়না । বৃষ্টি ততক্ষণে তার পুরোনো ছন্দ ফিরে পেয়েছে । ■

ক্ষুদ্‌দা কেন যে বইপ্রেমী

- অনুপম গুপ্ত

গত ২৫শে জানুয়ারী কলকাতার ই.এম বাইপাসের সন্নিকটে আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত মেলা প্রাঙ্গণে যার পোশাকী নাম "মিলন মেলা", সেখানে অনুষ্ঠিত হোল কলকাতা বইমেলা । ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে নিয়ে বইমেলায় গেলেন । বৌদিকে নিয়ে মেলায় যাওয়ার ইচ্ছা ক্ষুদ্‌দার ছিলনা । বৌদি সেখানে ১০০ শতাংশ অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু বৌদি নাছোড়বান্দা – নিতেই হোল তাঁকে । আগে প্রবেশমূল্য লাগত বলে ভিড় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছিল । এখন প্রবেশ অবাধ হওয়ার জন্য জনঅরণ্যের চাপে বইমেলা নিজেই স্তিমিত । ভয়ে বৌদি এমন নিবিড় ভাবে ক্ষুদ্‌দার বাহুলগ্না হলেন যে পরের দিনই দাদার জামাটা ধোপার বাড়ী পাঠাতে হল । ৪৫ বছর আগের এমন মধুর স্পর্শের অনুভূতি স্মৃতির পটে হঠাৎ প্রতিবিম্বিত হল বটে, তবে তখনকার রোমাঞ্চিত এপিসোড আজ হয়তো বিড়ম্বনার প্রাথমিক ইন্ধন ।

প্রবেশদ্বারের কাছ থেকেই নানান রকমের বিজ্ঞাপনের বাহুল্য । হাঁদাভোঁদা, কম্প্যুটার সায়েন্স, পাঁচ মিনিটে বিরিয়ানী রান্নার কৌশল, হস্তরেখার বিচার ব্যবস্থা, পেটের অজীর্ণতার নিরাময়, বিবাহিত জীবনের দীর্ঘায়িত সমস্যা ইত্যাদি বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভিড় । পুঁতির মালা, হজমি গুলি, গ্রাম বাঙলার দৃশ্য আঁকা রঙীন ছবি, মহাপুরুষদের ছবি, এমনকি শিল্পীকে দিয়ে "নিজের ছবি" আঁকানো ইত্যাদি আইটেমগুলোর সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক ঠিক কীরকম ক্ষুদ্‌দা না বুঝলেও বৌদির আগ্রহ এখানেই বেশী । বৌদির মেলায় প্রবেশের মূল আকর্ষণ মেলা প্রাঙ্গণের ফুড-স্টল থেকে বিক্রি করা চিকেন ফ্রায়েড রাইস ও ফিশ্ ফ্রাই দিয়ে দ্বিপ্রহরের আহার । বইয়ের স্টলগুলোতে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা করানোর কোন মানে হয় ? বইয়ের আবার তফাৎ হয় নাকি ?

প্রত্যেক বছর বইমেলার সময় বৌদি দাদাকে প্রশ্ন করেন – যারা বই লেখে তারা টাকা পায়, যেসব প্রকাশক বইগুলি ছাপায় তারা টাকা পায়, যারা ওই বই বিক্রি করে তারাও টাকা পায় । কিন্তু কিছু বোকা লোকেদের পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যাবে ওইসব বই কিনতে ? আসলে বইমেলার নামে প্রকাশকদের পাতা ফাঁদে বৌদির স্বামীদের মতো "বোকা" লোকেদের ফাঁদে ফেলাই উদ্দেশ্য ।

এই টাকা দিয়ে বই না কিনে প্রতি বছর আংটি, দুল বা নিদেনপক্ষে গড়িয়াহাট থেকে দামী শাড়ী কিনলে যে "ওয়াইজফুল ইনভেস্টমেন্ট" এটাই দাদাকে বোঝানো যাচ্ছেনা । বইমেলায় দাদা বৌদিকে জিজ্ঞাসা করেন, বইমেলায় এসেছো, কিছু বই কিনবে না ? বৌদির তাৎক্ষণিক উষ্মা প্রকাশ, তাহলে যারা শিল্পমেলায় যায়, বাড়ী ফেরার সময় কি তারা একটা লেদ মেশিন কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফেরে ?

সাহিত্যিকদের নাম মনে রাখার থেকে টিভি সিরিয়ালের কুশীলবদের নাম মনে রাখা অনেক জরুরী, রবিশংকর আর তারাশংকর কি দুই ভাই ? ঋত্বিকের নাম বললে ঋত্বিক রোশনের নামই মনে আসে । ঋত্বিক ঘটক, সে আবার কে ? জেমস লং আর জেমস বন্ড কি মামাতো পিসতুত ভাই ? একদিন বৈকালিক চা পানের সময় বৌদির প্রশ্ন বেহালায় জেমস লং সরণী আছে, কিন্তু জেমস বন্ডের নামে কোন রাস্তা নেই কেন ? ক্ষুদ্‌দার প্রচণ্ড বিষম লাগলো, এবং কিছুটা চা চল্‌কে পড়েও গেল । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা জায়গায় লিখেছেন, "মহিলাদের মাথা, নারকোলের মালা আধা বৈ পুরা দেখিলাম না," সত্যিই তো নারকোলের নাড়ু খেতে গেলে নারকোলের মালারই প্রয়োজন । কিন্তু নারকোল কুরিয়ে নেওয়া পরে যা পড়ে থাকে তার সঙ্গে রমলা চাকলাদারের মস্তিষ্কের গভীরতা নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ রচনা অবশ্যই লেখা যায় ।

জাপানের কাওয়াসাকির লাযোনাতে মারুযেন নামের এক দোকানে বিশাল পুস্তক সম্ভার আছে । ক্ষুদ্‌দা ওখানে বিভোর হয়ে বই দেখেন । রমলা বৌদি ভেতরে ঢুকতেই ভয় পান । আর ভেতরে ঢুকলেও সেখানে কি নন্টে ফন্টে, এক মিনিটে নুডুলস্, বিপদতারিণী ব্রতকথা, লক্ষ্মীর পাঁচালী পাওয়া যাবে ? বৌদি কিছুতেই বুঝতে পারেন না জাপানের মহিলারা কেন যে এইসব ব্রত পালন করেনা । ক্ষুদ্‌দা হাসতে হাসতে বলেন, জেনারেল তোজোর পরিবারের মহিলারা যদি শনি, সত্যনারায়ণ, বিপদতারিণীর পুজো করতো, শনি/মঙ্গলবারে যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করতো, বৃহস্পতিবারে ব্যাংক থেকে টাকা না তুলতো, শনি/মঙ্গলবারে মোচার ঘন্ট না খেত তাহলে হয়তো আজ হিরোশিমা নাগাসাকির ইতিহাস অন্যরকম হোত । ব্যাঙ্গাত্মক খোঁচাটা কি বৌদি বুঝতে পারলেন ? মনে তো হয়না ।

ক্ষুদ্‌দার উপদেশ, বৌদির মতো মহিলারা যেন ক্যালকাটা পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ডকে অনুরোধ করে যাতে জাপানেও বইমেলা করা হয় যেখানে জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা নন্টে ফন্টে, হাঁদা ভোঁদা, অরণ্যদেব, টুনটুনির বই এবং অবশ্যই গৃহিণীদের পূজা পদ্ধতির বই প্রদর্শন এবং বিক্রীর ব্যবস্থা থাকে ।

২০০৭ সালে জাপানে বেড়াতে গিয়ে ক্ষুদ্‌দা অনেক বই পড়লেন এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে দুটি শহরে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলেন কিয়োতো আর হিরোশিমা । কিয়োতো শহরে অনেক কিছু দেখেছিলেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ন্যাশনাল মিউজিয়াম । সেখানে আছে বহু বছর আগে জাপানে পূজিত দেবদেবীর মূর্তি । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই দেবদেবীর পূজা করা হোত, তাই এঁদের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর । ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে বোঝালেন কালের বিবর্তনে আমাদের দেবদেবী অনেক সুন্দর হয়েছে । বৌদির বক্তব্য, আমাদের দুগ্‌গা লক্ষ্মী সরস্বতীকে কত সুন্দর দেখতে । দাদা জিজ্ঞেস করলেন, মা কালীকেও কি একই জায়গায় রেখেছো ? ভাগ্যিস জবা/অপরাজিতা ফুলের মালায় সারা শরীর ঢেকে রাখার প্রচলন আছে, তা না হলে প্রত্যেক বছরে কালী পুজোর সময় ক্লাবের কর্মকর্তা ও কুমারটুলির মৃৎশিল্পীকে অশ্লীলতার দায়ে থানার হাজতে থাকতে হোত । ডাকিনী যোগিনী বানানোর সময় প্রত্যেক মহিলার উচিত কুমারটুলির সামনে অনশন করা যাতে উৎকট দৃশ্য দূষণের হাত থেকে নারী সমাজকে বাঁচানো যায় ।

হিরোশিমা শহরেও দাদা বৌদি গেলেন । দাদা বললেন, এই শহরে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট এ্যাটম বম্ব ফেলা হয়েছিল । প্রতি বছর সারা পৃথিবীর বহু লোক এখানে আসেন ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন । বৌদির প্রশ্ন, এখানেও তো কালী পুজোর সময় হাজার হাজার চকলেট বোমা ফাটানো হয় । কই কেউ তো এখানে আসে না ? কয়েক হাজার চকলেট বোমা একসঙ্গে করলে তো এ্যাটম বোমার সমান তাই না ? উত্তর দেওয়ার চেয়ে দাদা জানলা দিয়ে জাপানের রাস্তা দেখাই শ্রেয় বলে মনে করলেন ।

বই ক্ষুদ্‌দার ভালবাসা, বই ক্ষুদ্‌দার নেশা । দাদা পড়ার জন্য কত লোকের কাছ থেকে বই আনেন, কত লোককে বই পড়তেও দেন । কিন্তু সবাই যে বই ফেরত দিয়েছে এমন কথা কি জোর দিয়ে বলা যায় ? অবশ্য দাদাও যে সব বই তাদের ফেরত দিয়েছেন এমন কথা কি হলফ কোরে বলা যাবে ? ওই জন্যেই তো বৌদি বই নেওয়ার সময় খাতায় নাম ঠিকানা লিখে রাখার সিস্টেম চালু করতে চেয়েছিলেন যদিও দাদার আপত্তি এটা নাকি মুদীর দোকান থেকে ধারে মাল নিয়ে লিখে রাখার মতো ।

দাদার এক আত্মীয়র বাড়ীর সৌখিন ড্রইং রুমে সুদৃশ্য আলমারীতে নামীদামী লেখকদের সুশোভনের সংস্করণের লোভনীয় বই সজ্জিত । ক্ষুদ্‌দা একবার একটা বই দেখানোর জন্য ওই আত্মীয়কে অনুরোধ করলেন । বলাবাহুল্য অনেক খোঁজাখুঁজির পরে চাবিটা পাওয়া গেলেও ওই চাবি দিয়ে বইয়ের আলমারী খুলতে গৃহকর্তা একটু ভয় পাচ্ছিলেন । আসলে বেশ কয়েক বছর আগে ইন্টিরিয়ার ডেকরেটরকে দিয়ে এ্যাপার্টমেন্টটা সাজানোর সময় যামিনী রায়ের ছবি, বাঁকুড়ার টেরাকোটার মূর্তি এবং এই বইগুলি কেনা হয়েছিল – যেগুলো দেখার জন্য, ছোঁয়ার জন্য নয় । দাদা মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, তিনি বিশ্বকবি হতে পারেন, কিন্তু বাঙালীদের নন ।

বই মানুষকে কল্পনার জগতে প্রবেশের চাবিকাঠিটা দিয়ে দেয় যা দিয়ে মানুষ দুঃখে সান্ত্বনা পেতে পারে, রোমাঞ্চে আনন্দে আত্মহারা হতে পারে । ছোটবেলায় ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির বই, ক্ষীরের পুতুল বা অলিভার টুইস্ট, স্নো হোয়াইট, সিনড্রেলা পড়ার পরে যে কল্পনার জগত তৈরি হয় এবং যে বা যারা সেখানে প্রবেশ করে আনন্দ পায় তাদের মতো সুখী হয়তো আর কেউ নয় । ক্ষুদ্‌দা মনে মনে আক্ষেপ করেন রমলা এই রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত । অবশ্য এখন আর কিছুই করার নেই । বৌদির বক্তব্য, বই পড়ার থেকে টিভির সিরিয়াল দেখা অনেক ভাল । আসলে ছোটরা যখন তাদের শৈশব বা কৈশোর জীবনে দেশ বিদেশের রূপকথার বই নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, তখন রমলা বৌদি তাঁর পুতুল কন্যার বিয়ে দিতেই ব্যস্ত থাকতেন । ভগবানের অশেষ করুণা রমলা বৌদি ভাল পুতুল পাত্র পেয়েছিলেন । ■

আমার দেখা "ওকুরিবিতো"

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

"স্লাম ডগ মিলিয়েনিয়ার" যখন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সম্মান পেয়ে প্রায় প্রত্যেক দেশের প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে আর বাড়ির বাচ্চারা জামাল সেজে বিভিন্ন কুইজের খেলায় মত্ত, সেই বছর বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির সম্মান

পেল জাপানি ছবি "ওকুরিবিতো" (DEPARTURE)।

এদেশেও কিছুদিন ধরেই টিভির পর্দায় বিভিন্ন চ্যানেলে পুরস্কার হাতে পাবার মুহূর্ত বা রেড কার্পেটের ওপরে শিল্পীদের চলাফেরার মুহূর্ত, ইন্টারভিউর মুহূর্ত দেখানো হয় ।

"বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী সিনেমা" ---আগ্রহ বাড়ে । নাইট শো-এর টিকিট কেটে ঢুকে পড়ি হল-এ ।

মিঃ কোবায়াশি সস্ত্রীক টোকিওতে থাকেন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে । একটা প্রফেশনাল ক্ল্যাসিকাল মিউজিক গ্রুপের চেলো শিল্পী । স্ত্রী ওয়েব ডিজাইনার ।

সেদিন একটা কনসার্টের পর গ্রুপ লিডার হঠাৎ করেই সবাইকে ডেকে গ্রুপ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেন । সবাইকে মাস-মাইনে দিয়ে গ্রুপ টানা আর সম্ভব হচ্ছেনা । মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ে কোবায়াশির । এই তো কয়েক দিন আগেই অনেক টাকা খরচ করে নতুন চেলো কিনেছে বৌয়ের চোখ এড়িয়ে । নিজেই স্বীকার করে চেলোর ব্যাপারে তার হাতে এমন কোন অসাধারণ যাদু নেই যাতে করে সে চেলো পারফর্মার হিসেবে আয় করতে পারে । গ্রুপ বলেই চলছিল কোনরকম । অগত্যা বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের গ্রামে ফিরে যাবে বলে মনস্থ করে দুজনে ।

ইয়ামাগাতা । এখানেই জন্মেছে এবং বড় হয়েছে কোবায়াশি । বাবা, কোবায়াশির ছেলেবেলায় বৌ-বাচ্চাকে ফেলে অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধে । মা, বাড়ির একতলায় একটা কফিশপ চালিয়ে বড় করে ছেলেকে । মা মৃত্যুর সময় ছেলেকেই দিয়ে যান এই বাড়িঘর । তাই টোকিও থেকে ফিরে এখানেই শুরু হয় ওদের নতুন সংসার । শান্ত জায়গা । পাড়া-প্রতিবেশীরাও চেনাজানা ।

খবরের কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে যায় কোবায়াশির । N.K

Agency। নিচের লেখাগুলো পড়ে যা বোঝে, এটা একটা Travel Agency। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ইন্টারভিউর দিন ঠিক করে নেয় । পরদিন হাতে কাগজের কাটিং নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় N.K Agency। ঘরের মধ্যে এক মহিলা বসা । কোবায়াশি নিজের পরিচয় দিতে বসতে বলে । বস্ একটু বেরিয়েছেন, এক্ষুণি ফিরবেন । দু তিন মিনিটের মধ্যে বস্ ফেরেন । কয়েকটা কথোপকথন হয় । বস্ বলেন তোমার চাকরী হয়ে গেছে, তুমি ইন্টারভিউতে পাশ করেছ । অবাক হয় কোবায়াশি । সেকি! কিছুই তো জিজ্ঞাসাই করলেন না ! কোবায়াশি নিজেই কথা পাড়ে এবার । কিসের কাজ হয় এই N.K Agency তে ? বস্ এবার মুখ খোলেন । NOUKAN এর শর্ট ফর্ম N.K। কোবায়াশির একটু ভয় ভয় করে । ও যতদূর জানে মৃত্যুর পর Kanঅর্থাৎ একটা কাঠের বাক্সে মৃতদেহকে ভরা হয় । সেই পদ্ধতিটির নাম NOUKAN। হ্যাঁ, সেই কাজই করে এই Agency। কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে এই Agency তে ফোন আসে । ব্যস্ততার শেষ নেই । রোজই দু তিনটে ফোন আসে আর ছুটতে হয় সেই বাড়িতে । AGENCYতে স্টাফ বলতে ঐ মহিলা যিনি অফিসে বসেন আর বস্ । খবরের কাগজে অনেকবারই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কিন্তু কাজ হয়নি । এমন একটা কাজ, কেউ রাজী হতে চায়না । তাই অনেক ভেবেচিন্তে এবারের বিজ্ঞাপন এমনভাবে ছেপেছেন যাতে মনে হবে কোন ট্রাভেল এজেন্সি । "তাবি নো তেৎসুদাই ও শিমাসু", অর্থাৎ ভ্রমণ-যাত্রার যে কোন সাহায্য আমরা করে থাকি । এও তো যাত্রাই বটে । স্বর্গযাত্রা । বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে চাকরির সুখবর দেয় । রাতে ভালমন্দ খাওয়া হয় । পরদিন থেকে কাজ শুরু ।

অফিসে ঢুকেই দেখে বস্ ওর জন্য অপেক্ষা করছেন, কাজে বেরোতে হবে । প্রায় কুড়ি মিনিট গাড়ি চালিয়ে দুজনে পৌঁছে যায় নির্দ্দিষ্ট জায়গায় । এ বাড়িতে এক বয়স্কা মহিলার মৃত্যু হয়েছে । বাচ্চারা বলছে ওবাআসান (ঠাকুমা অথবা দিদিমা), মধ্যবয়সীরা বলছে ওকাআসান (মা) ।

N.K.AGENCYর ওরা দুজন গাড়ি থেকে Kan(বডি ঢোকানোর কাঠের বাক্স) নামিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকে । ঘরের মধ্যে বিছানায় শোয়ানো বডি । এক ছেলে এগিয়ে এসে বলে মায়ের বিয়ের এই কিমোনো পরিয়ে আমরা যাত্রা করাতে চাই । যেমন অনুরোধ তেমনি কাজ । কোন ত্রুটি নেই তাতে ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষ হাতে মহিলাকে লাল টুকটুকে কিমোনো পরিয়ে তার সঙ্গে মানানসই কেশসজ্জা আর মেকআপ করিয়ে দেন বস্ । অবাক হয়ে প্রথম থেকে সব লক্ষ্য করে কোবায়াশি । গত রাতের মৃত ঠাণ্ডা শরীরটাকে কি নিপুণতার সঙ্গে সাজিয়ে দেন Kan এ ঢোকাবার আগে । সিনেমার গল্প চলতে থাকে পর পর বিভিন্ন মৃতদেহকে কেন্দ্র করে । মা জন্ম দিয়েছিলেন পুত্রসন্তানের । কিন্তু সেই ছেলে স্কুলে যাবার সময় থেকেই মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে, মেয়েদের পোশাক-আশাকে আসক্তি বেশি । কানে দুল, চোখে আইশ্যাডো, মেয়েদের ফ্রক পরাতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে । একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও বাবা ছেলের মুখ দেখা বন্ধ । আত্মীয়-স্বজনের কড়া চোখ, কটুক্তি আর সহ্য করতে না পেরে অকাল মরণ বেছে নিল ছেলেটি । N.K Agency র বস্ আর কোবায়াশি ফোন পেয়ে ওই বাড়িতে পৌঁছতেই মা দৌড়ে আসে একটা গোলাপী রঙের ওয়ানপীস নিয়ে । এদিন বস্ কোবায়াশিকে কাজে এগিয়ে দেন । কোবায়াশি মনপ্রাণ দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে ঠোঁটে লাগিয়ে দেয় লাল লিপস্টিক । এই Agency তে থানা থেকেও ফোন আসে আর ছুটতে হয় মাঝেমাঝেই । এক বৃদ্ধ একা থাকতেন কিছুদিন ধরে প্রতিবেশীরা কেউ তাকে দেখেনি । পুলিশে খবর দেয় এরাই । পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই বোট্‌কা গন্ধ নাকে লাগে । বার্ধক্যে মৃত্যু, তাও প্রায় দশ দিন হয়ে গেল । ডাক পড়ে N.K Agency র । Kan নিয়ে হাজির হয় এরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব । চলতে থাকে সিনেমা ।

আমি হল-এ বসে NOUKAN এর কাজের পারদর্শিতা, নিপুণতা দেখে মুগ্ধ হই, চোখের পাতা পড়েনা ।

এদেশে এসে প্রথম যেবার Sado বা tea ceremony দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল কোন stage এ show দেখছি । নিস্তব্ধতার মধ্যেও এমন সৌন্দর্য থাকতে পারে প্রথম অনুভব করেছিলাম সেদিন । আজ প্রায় ১৬ বছরেরও বেশি Sado র সঙ্গে নিজে যুক্ত থেকে নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝি এ ত শুধু চা বানিয়ে পরিবেশন করা নয় । আগুনের প্রতি, জলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন । সর্বোপরি অতিথি আপ্যায়ন । অতিথি পূজা ।

এই সিনেমাটাও যেন এক নিস্তব্ধতার আর্ট । গা শিরশির করা বিষয় বটে, কিন্তু এমন স্বচ্ছ আর সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায়না । আবহসঙ্গীতে বাজতে থাকে চেলো অবিরাম । টোকিও থেকে স্থান পাল্টে যায় ইয়ামাগাতায় । মনছোঁয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । কৃতজ্ঞতা জানাই পরিচালক মিঃ তাকিতা ইয়োজিরোকে । মৃত্যুর পরে স্বর্গযাত্রার প্রস্তুতি, তার বিস্তৃত আর, নিখুঁত দৃশ্যগুলো না থাকলে হয়তো পৃথিবীর কাছে Noukan বিষয়টা অজানাই থেকে যেত । ■

২রা জুন

- জ্যোর্তিময় রায়

ঝির্ ঝিরে হাওয়ার দিন ছিল কাল,
তোমার আমার ভালবাসার ডাল
সে হাওয়ায় কেমন দুলছিল,
পাতায় শির্ শির্ আওয়াজের তাল ।
তোমার দোল খাওয়া এখনও চলছে
ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, বারান্দার অবকাশ
বাগান বিলাস
রামধনু রঙে রংগীন হয়েছে ।
আমার এখানে গরমিল সব
রোদ ফাটা দিন, ধূলোর আকাশ ।
ফেলে আসা সব ২রা জুনের জটলা বসেছে ।
বন্ধুজনের অতি পরিচিত মুখ, মুখের কলরব।
কাঁচ ফাটা গ্লাসে
বরফ শীতল রাম, বার বার আসে
বিরিয়ানী দই মাছ ।
বকুলের গাছ
শীর্ণ সবুজ রাত ছায়া আর অন্ধকারেতে রয়েছে ছড়ানো
শেষ রাত সব ঘুরে ফিরে আসে
ঘরের দেয়ালে, বিছানার ঘাসে ।
কাল তুমি, মনে পড়ে, কাছে ছিলে না
কথা দিয়েছিলে কেন রাখলে না ?
হতাশ পাখিটা ডানা মেলে ডালে দোল দিলো ।
কথা আর কাজে মিল ছিল ?

হাওয়া বদল

- শংকর বসু

এই নাও কারবন সালফার ও হাতে
ফুসফুস ঝামা হয় হাত কচলানিতে
আর যত সাদা-নীল যত কিছু রুচিশীল
রঙিন ফানুসে পাড়ি সাগর-পারে
কালো হাওয়া পড়ে থাকে আমাদের ঘরে ।

এ হাওয়ায় পুড়ে ছাই শহরের ইতিহাস
এলোমেলো রূপকথা লুকোচুরি খেলা
লাল-নীল পৃথিবীর সাদা-কালো ছবি
অসাড় শরীর ভাসে বরফের মেঘ
এ হাওয়ায় জমে গেছে গরম আবেগ ।

এসো আজ খুঁজে নিই প্রবাসীর হাওয়া-বীজ
ডাকের চিঠিতে মোড়া হাওয়া-ভরা বাক্স
সাদা-হাওয়া কালো-হাওয়া মেলে মেশে ফুসফুসে
এপার ওপার মেলা তিরতিরে হাওয়া সেতু
ফিসফিস কথা পাড়ে হাতে হাত রাখে
গাংচিল উড়ে ফেরে শেষ রাতে
টলমল হাওয়া ব্রীজ ভাত ঘুমে থাকে ।।

কাঠঠোকরা

(জাপানি ভাষায় মূল রচয়িতা – কাজুকো শিরাইশি)

অনুবাদ – নবনীতা দেবসেন

একটা কাঠঠোকরা এসে পড়লো, খেটেখুটে
কাঠের বাড়িটায় গর্ত করলো যেই –
উড়ে বেড়িয়ে এলো একটা লোক, ওকে শাসালো –

৮ বচ্ছর ধরে লোকটা
একটা বাড়ি বানাচ্ছিলো
ওর বউ আর দুই ছেলের জন্যে

তারপর
কাঠঠোকরা সেখানে গর্ত করবার আগে
এক অদৃশ্য কাঠঠোকরা এসে
ওর বউএর ভেতরে একটা গর্ত খুঁড়ে গেল

সেই গর্ত দিয়ে ওর বউ
কোথায় যেন উড়ে গেল
আর ফিরলো না

কাঠঠোকরারা আসে, বহু পরিশ্রমে
মানুষের গড়া কাঠের বাড়িতে ঠোক্কর মারে

(এই কবিতাটির অনুবাদ প্রসঙ্গে)

জাপানি কবি কাযুকো শিরাইশি এবং গোযো ইয়োশিমাসু-র সাথে প্রথম আলাপ হয় ১৯৮৬ সালে তোকিয়োতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের ভবনে আয়োজিত এক কবি সম্মেলনে । ১৯৮৮ সালে ভূপালের ভারত ভবনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে উক্ত দুই কবিকে আমন্ত্রণ জানাই। সেই সম্মেলনে কবি শিরাইশি স্বরচিত 'কাঠঠোকরা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন । সেই সময় থেকে তাঁদের সাথে গড়ে উঠেছে এক প্রীতির সম্পর্ক । পরবর্তীকালে, শিরাইশির অনেক কবিতা আমি অনুবাদ করেছি ।

ফিরে এসো পক্ষীরাজ

- বিশ্বনাথ পাল

এক যে ছিল রাজা-র কথা কেউ বলে না আর,
এযুগের গল্পে রাজার নেই কোনো কারবার ।
নীলকমল – লালকমল হারিয়ে গেছে আজ,
রাজপুত্র আসেনা আর উড়িয়ে পক্ষীরাজ ।।
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীদের যায়না কোথাও দেখা,
ঠাকুরমার ঝুলি সব ধুলোয় আছে ঢাকা ।
ছোট্ট শিশুর স্বপ্নপুরী বদলে গেছে আজ,
রাজপুত্র নেইতো সেথায়, নেইতো পক্ষীরাজ ।।
যুগটা যেন রকেট চড়ে উড়ছে মহাকাশে,
কল্পকথা ঠাঁই পায়না Star War এর পাশে ।
আসল কথা নেইতো সে আর একান্ন পরিবার,
নাতি, নাতনী, ঠাকুরমাদের ভরন্ত সংসার ।।
তার উপরে বাড়ছে শুধু পড়ার বই-এর বোঝা,
ভুলেই গেছে ঠাকুরমাদের গল্প শোনার মজা ।
ঠাকুরমাদের জীবন জুড়ে শুধুই দীর্ঘশ্বাস,
সব খুইয়ে ঠাঁই মিলেছে হয়তো বৃদ্ধাবাস ।।
কিন্তু কেন এমনি করে হারিয়ে যাবেন তাঁরা ?
মোদের জীবন পূর্ণ করে শূন্য হলেন যাঁরা ।।
ঠাকুরমারা আসুক আবার ঝুলির ধূলো ঝেড়ে,
পক্ষীরাজও আসুক উড়ে শিশুর স্বপ্নপুরে ।।

শরৎ রমণী

- রাজকুমার পাল

মেলিনু নয়ন বরষের পরে
কিভা শোভা বয় বঙ্গালয়ে
ঝিলিক মারে প্রাণে।
চোখে লাগে স্নিগ্ধতার মায়াঞ্জন
স্বপ্নে বিভোর মন
হৃদয় ভরে নব জীবনের গানে।।
নিঃশব্দ চরণ ফেলে
সজল বরষা যায় ফিরে চলে
বাজায় করুণ মধুর আগমনী।
নীল গুণ্ঠনে সোনার কল্কা পরে
শুভ্র মেঘের মন্থর শালতি চরে
আসে অগোচরে এক মনোহরা রমনী।।

অপরাজিতার নাসিকালংকার
কৃষ্ণকলির মাল্য ঝঙ্কার
নদে নুপুর বাজে।
সোনালী সবুজ অঙ্গ বসন
শালুকফুল কর্নভূষণ
সিন্দুর বিন্দু জ্বলে নীলানন মাঝে।।
শিউলি বিতানে ভ্রমর গুঞ্জন
দোয়েল পাপিয়ার সুর কূজন
হৃদয়ে মধু ঝরায়।
শিশিরসিক্ত তৃণপল্লবে শিউলি পরি
তারে পরে পদ দিয়া চলে সুন্দরী
নব রঙ রাঙায় এ ধরায়।।

প্রভাত অরুণের রক্তিম আলো
নম্রকান্তি ভুবনে মোহন লজ্জা ঢালো
মায়াবন্ধনে ভুলায় কোমল হৃদয়খানি।
ধান্যক্ষেতে রোদ-ছায়ার লুকোচুরি খেলা
শ্যাম-শস্য হিল্লোলে আনন্দমেলা
নদীকূলে কম্পমান কাশফুলখানি।।
নদী সরসীর বুকে কুমুদ কহ্লারের শোভা
চারিদিকে প্রসন্ন হাসির প্রভা
জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীর মোহিনী হাতছানি।
পুষ্করিণীর শালুকের পাপড়ি খোলা
স্নিগ্ধ পবনে ধান্যমঞ্জরী দোলা
সুখের অলকাপুরে নেয় হৃদয় টানি।।

মানব মনোলোকে চরণ সঞ্চারণ
আকাশে বাতাসে ভাসে বাদ্যখঞ্জন
আনন্দস্রোত আর কলোচ্ছ্বাস।
শারদীয়া-লক্ষ্মী-শ্যামা পূজা অঙ্গন
ভাতৃ দ্বিতীয়ার সঙ্গমে মেলবন্ধন
মর্ত্যকে দেয় অমরাবতীর আশ্বাস।।
শিশিরসিক্ত শিউলি পথ ধরে
মানব হৃদয় ব্যথিত করে
বিদায় নেয় অপরূপা রমণী।
মনের কোণে বিষন্নতা লয়ে
অশ্রুবিধুর আকুলতা বয়ে
বলি তারে রূপ-গন্ধ লয়ে আবার এসো এ ধরণী।।

ডিজায়ার

- ঈপ্সিতা হালদার

ততক্ষণে আমি প্লেটনিক যুদ্ধে হেরে গেছি, কথা বলেছি
সূপ ঢেলে দিয়েছি তারপরই রোয়িং রোয়িং রোয়িং
দক্ষিণ থেকে চলে গেছি প্রায় হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত
আর দীর্ঘ ছায়া আমার ওই অর্থোডক্স চার্চ
বন্ধ সিনাগগ অবধি গিয়ে পড়েছে ।
তেল কালি ঢালা অর্ধেক বন্ধ ট্রাম লাইনের পাশে
লোহা গুদামের পাশে চামেলি ফিল্ম লেট ক্যাপিটালিজম
চা ডিমটোস্ট সোনি শোরুম শ্রী শ্রী চণ্ডীর পাশে
আমাকে নগ্ন কর প্রকাশনা সংস্থার একটু আগে ।

যেন হেঁটে চলে গেছেন দেবদূতেরা । ওই এখনও
একটু আলো তাঁদের ডানায় ফড়িঙের মত খেলা করে ।

ততক্ষণে বেড়াল প্রকাশনার কার্নিশ থেকে জেগে উঠে
হামাগুড়ি দিয়ে নেমে যাক সাবওয়ে দিয়ে ।
ততক্ষণে আমাদের নানা রঙা অল্প ছেনাল পেটিকোটগুলি
ছাদে উড়ুক হাওয়ায় ।

শান্তির সন্ধানে

- নমিতা চন্দ

রাঙা জবা পায়ে দিতে গিয়ে
মরি আমি মা লজ্জা পেয়ে
শ্মশান মশান ঘুরে ফিরে
বসন কোথায় ফেলে এলি ?
তোর রূপ মা গো যদি কালো
তবে মুণ্ডমালা কি কভু শোভে
কি যে এত দেমাক মা তোর
রাখলি পদতলে যিনি মহেশ্বর
ঘুরে ঘুরে অনেক দুয়ার
শান্তি কোথাও পেলাম না আর
শেষে তোর চরণে নিলাম শরণ
হৃদয়ে জবা দিয়ে করব বরণ
চোখের জলে দেব তোর পা ধুয়ে
দেখবো কেমন মুখ নিস ফিরায়ে ।।

নিঃসঙ্গতা

- সুজাতা চৌধুরী

পার্কে বসেছিল এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা ,
ইতিউতি তাকাচ্ছিল ,
চোখের তারায় পিপাসা ,
নাকি আরও কিছু , স্মৃতি রোমন্থন
ফেলে আসা যৌবনের ,
নাকি সুদূর শৈশবের ?
হারিয়ে যাওয়া কোন মানুষের
হঠাৎ হাতছানি , অথবা শুধুই স্মৃতিভ্রম
মনে না পড়া সময়ের খোঁজ ,
অতীত , বর্তমান , বা ভবিষ্যতের আনাচে কানাচে
অবশেষে না পাওয়ার বেদনা
বা পাওয়ার তৃপ্তি
দুই সমান্তরাল বোধের
মাঝামাঝি থমকে যাওয়া
অথবা আদি থেকে অন্ত
শুধুই নিঃসঙ্গ ?

Daily Compassion

- Stephen Cotton

A few years ago I decided to make compassion a central part of my life. Since making that decision I have faced a variety of challenges; specifically how do I make compassion a part of my daily life. I understand it is easy to talk about compassion when you sit in a room with nothing but a computer or when surrounded by like-minded people who share your ideals. It is a very different story when confronted with hostile people or people who dislike you or have an agenda contrary to a life of compassion. So I would like to share with you my story and hopefully it can give insight on how we can all grow compassion daily.

Living in a developed country, whether it be Western or Asian, especially life in densely populated cities – creates some unique challenges for practicing daily compassion. Within most developed countries infrastructure is more reliable, there is greater choice, it is easier to go places - life is just more convenient. We can live in big cities without having much personal contact with other people. In fact many people living in big cities prefer to keep to themselves.

I have lived in Tokyo for more than a decade and have been influenced by a pervasive energy… it is the energy of "being busy". All my friends are busy living life, so busy that I rarely get to see them. I am the same way. And this busy energy becomes a mindset which can trap you. You become so busy with your own life that you stop paying attention to what is going on around you. You wake up and busily check your emails, then busily eat your breakfast, then wash down your food with a busy cup of coffee… realizing the time, you then busily rush to get ready for work. Busy little bees that we are.

You leave the house and get in your car or catch a bus or train – on your way to work - all the time listening to music, checking emails, reading what your busy friends are doing via social media or playing games on your mobile phones. And you are disconnected from all the people around you; not really caring what others are feeling or thinking. And the pervasive busy energy of the city carries you along and keeps you apart from others. And there is good reason for being this way – I especially feel this during the morning rush hour, as I am cramped into a crowded train… and at each stop even more people push their way into the already jam packed train. To bare this on a daily basis you have to numb yourself to the feelings of others and even repress your own feelings.

So do you think such a busy life would be advantageous for practicing compassion? In my opinion it is not a good environment for growing any caring feelings.

And this is a great challenge… how to grow compassion when living such a busy lifestyle? This lead me to ask, "What is compassion really?" Is it really absent or can compassion work subtly in our busy lives? This has been my journey, which continues even till today – to discover daily compassion and how it manifests naturally in this busy world.

One may argue that compassion is the realm of religious people, people with more time or those living in an environment which promotes such beliefs. Therefore if you really want to have a life where compassion is at the center, then you need to become a monk, or live in the country side where things move at a slower pace and avoid big cities.

My life has never presented me with such choices and yet I still want to grow my compassion. And if I feel this way then maybe other people also feel this need – the desire to live more compassionately, despite living in unfavorable environments. So I thought to myself – there has to be a way to live in a big city – with a busy lifestyle and still practice compassion daily. I had to redefine my thinking on compassion – moving away from the religious and political connotations. And a few key phrases came to mind "little things matter", "expect nothing in return", "forgive often", "don't react immediately", "patience is central".

So what do I mean by each phrase?

Little Things Matter

Usually we don't grow our compassion by grand gestures and acts. In this convenient world - rarely does life present you opportunities to express your compassion on a grand scale. Even though we cannot be brave citizens saving a life; we can still contribute through small acts of kindness. It all adds up and we can build our compassion through small acts. Compassion is life and like any living thing, it grows slowly over time. So too will your compassion grow through small acts of kindness. Such acts can be to hold a door open for someone, to let someone go before you, to hold an elevator door open for others, to say please and thank you (and really mean it), to smile and treat others with kindness - little things. You might think it ridiculous to think of this as acts of compassion and such things are just common courtesy. But be honest when did you do these small things daily and often – when was the last time someone held the door open for you? In this busy life these courtesies are not so common. And when did you do these small acts with the intent of growing your compassion?

Expect Nothing In Return

Growing up we are taught that when we are good, we are rewarded. As children we are rewarded for our good deeds. We come to expect rewards in the form of kind words or even material things. But as we grow older we soon discover that even when we do good, some people will take us for granted or take advantage of our kindness. When this happens we become disappointed in life and others. We can become pessimistic about life. Then we learn a new lesson - to only give to others when rewarded and when we are not rewarded to stop giving. This attitude can send us along a path away from compassion and we can miss out on the joy that comes from giving without expectations. To truly grow your compassion we need to give and even if we are not rewarded for our kind acts - we still need to give to continue growing our compassion.

By giving without expectations we can avoid the feelings of disappointment, anger and hate that comes from not having our expectations met. And remember you are giving and being kind for yourself - to grow your compassion - not to receive a reward.

Forgive Often

This busy life can wear us down - especially when everyone is going about their life - highly motivated to achieve their goals and not caring about others. When you come into contact with such people throughout your day - negative feelings can build up. When someone is rude, nasty or uncaring towards you - feelings of anger can build up and if you hold onto this anger it can grow into hate.

By forgiving and letting of the feelings of disappointment and anger often - we can stop those feelings growing into rage and hate. I know from experience that forgiving is one of the hardest things to achieve. Once I realized that I was forgiving others to help myself; to lighten my load; to free myself from negative emotions - I was able to let go of the notion that forgiveness benefited others and I was able to really feel how forgiving was helping me stay compassionate. When I was not holding grudges against others I felt lighter and was freed of the negative emotions and it became easier to forgive again. By forgiving the small things often I was helping myself to be compassionate.

But forgiving doesn't always come naturally and we can get caught up in our negative emotions or in the negative emotion of others. At moments like this I have a practice that can help. I stop talking and take a few deep breaths. I use my imagination to visualize the negative emotions as a black smoke and positive emotions as white light. I then breathe in white light - which is positive emotions - and I breathe out the black smoke - which is negative emotions - all the time being silent - no matter what is happening around me.

I found that this breathing practice gives me time to calm my nerves and my silence can stop feeding the negative situation. It takes time and practice to achieve this level of self-control - where you can calm your nerves just by breathing. So I recommend you do this by yourself often - when ever you feel yourself becoming tense or on edge.

I need to say one more thing about forgiveness – most of us view it as forgiving others. Sometime the most important act of forgiveness is to forgive yourself. Where daily compassion is concerned you might find yourself getting angry or tired of busy life and will act contrary to compassion. We are all human and will slip up – so learn to forgive yourself.

Don't React Immediately

In life sometimes quick decisions and immediate reaction is required to quickly resolve a problem. And those who have lots of experience and knowledge in a certain subject can quickly react and solve the situation. And this works very well when you are dealing with mechanical structures, computer systems or some other man made system. When it comes to human emotion I have found that reacting immediately to a negative situation, can result in making the situation worse.

For example, your child is not behaving and is being naughty. You can react immediately by yelling at the child, hitting them up the side of the head or bending them over your knee and giving them a good spanking. This may give immediate results, where the child's bad behavior stops. And you may be able to use the treat of this to curb further bad behavior. But that child will grow up and the negative behavior will become greater to match your aggression. And at some point you won't be able to control them through immediate reaction - aggression and inducing fear. At some point your child will become out of control.

I know this, because I have seen it first hand in my own family - where watched my older brother have a fist fight with my father. Now this is a very personal example, but this example can translate to many situations in daily life. When you are walking down the street and someone bumps into you or gives you a rude look or says something nasty to you, naturally we want to react immediately, by yelling back, bumping them or giving them an even nastier look. And since that stranger is really out of your control and what they will do is totally unpredictable - you run the risk of making a bad situation worse. More often than not your immediate reaction will result in making it worse.

So in the spirit of compassion I have a practice of not reacting immediately. It is like a fire - a fire starts with a spark and if you add wood to the fire - you are adding fuel and the fire will grow larger. By not reacting immediately - staying calm within and giving some time for the negative emotions (that initial spark) to die down - we give ourselves room to think and when we do act we have a greater chance to act compassionately.

Sometimes when faced with an unruly child - it can be very difficult to stay calm - so I have a practice which can give you and your child the time and space to calm down. I have a space in the house where we go to talk things through. So when the child misbehaves I ask them to go to that place and I stop talking. I stay where I am and take a few deep breaths to calm down. This also gives the child time to calm down. Once you are calm you can go and talk things over.

Now in daily life outside of the home we cannot always designate a place to go, to calm down and talk things through. But we can create such a place in our own mind. I have found that by becoming silent and shutting my eyes, I can mentally separate myself from the negative situation. Combine this with a few deep breathes, where I breathe in white light and breathe out black smoke - I can calm myself - no matter what is going on around me. At first it may not work - but with practice I have found it to become more effective.

The key is to give yourself time to react – even a delay of seconds or a minute - just don't react immediately. If you do this you will find over time – your ability to act compassionately will be infinitely more probably, than if you reacted immediately.

Patience Is Central

When we plant a seed in a garden - we water it, give it sunshine, feed it nutrients - the seed germinates and grows slowly over time. This is how I view compassion - as a seed and having the seed of compassion grow inside you slowly over time. And if we look at nature – we see such variety – trees of different sizes with an assortment of foliage. Even within the same family of trees we still see great diversity. So too will your story of compassion be different to mine or other people.

Your compassion practice will grow over time – no need to rush it – I just encourage you to find your own path and practice as often as possible – and be patient with yourself and with others.

In this modern world we want immediate feedback and access to the latest information. Compassion for me is an emotional muscle, a seed that needs attention to grow. When we exercise that emotional muscle it will get stronger – when we nurture the seed and feed it, our compassion grows within us.

In the beginning we may see little results but over time we will see a change and hopefully for the better.

The Journey

So even though we live in a big city, remember that it is important not to give up the practice of daily compassion. And at this stage of my life I feel it is important to remain in the big city, to refine my practice and as the journey continues redefine my understanding of compassion. There is no right way and each journey will have its joys and disappointments. Remember it is your journey and the path you travel is your choice.

I hope this story and the ideas within give you inspiration and hopefully one day I can hold a door open for you and thank you with a smile. ■

Examination habits and Stories

- Sougata Mallik

There is always something or the other in life that keeps reverberating back to us, whether we like it or not. For me it seems to be examinations. Now that I look back, I find it has been like a constant travel companion for me. I have written them in India, United Kingdom, Japan and now I am writing it in North America. So it only seems reasonable that when I should be contemplating over the rising prices of daily commodities, mull over global job market - I am musing over exam habits and exam superstitions that I have had for such a long time....

My predominantly enduring recollection on the morning of examination was offering prayers, flowers and yoghurt to Lord Shiva. This was dictated and proficiently contrived upon me by my grandmother. I was only in Grade 2. I did as I was told. Second, was a revision schedule on the morning of examination day. Mother would set the alarm clock at 5 am, have a cup of Horlicks ready and expect me to vault out of bed and start revising immediately. My father had a much cool approach. He thought if you have studied already then being carefree, calm helps more in examination. He would add little anecdotes of how he went to see movies before his MBBS final exam. But Queen of the house is always a strong monarch. In some instances her verdict will be final. So it was in this case my mother stood strong, and I revised and revised.

A little ahead in the time, I think I was in Grade 8. Circumstances demand that by that age you have to become serious, self disciplined, focused etc etc. Almost all good, stable qualities are expected of you. As always I had impending term examination in school; on the other hand 'Cricket fever' had fully infested city of Calcutta and the game of India vs England was bringing out the best in players at Eden Garden. At home my father was also under this cricket fever. Besides treating patients, this was all he thought or talked about. I have ceaselessly been a blind, ardent follower of my father right from my childhood. It was only natural that I endorsed from him all techniques of cricket playing, memorized all statistics, identified all players by appearance though TV broadcast showed a miniature figure of them from far away. I was also in Grade 8 and supposedly assumed to be mature; it was my responsibility to weigh the significance of an examination or a cricket game. I have to admit I did not do justice to the first. Not very well prepared, it was the exam day morning. I was intimidated, regretful - and this is when superstition crept into my system without prior notice. On the day of the exam, inadvertently I started isolating stationary pens, pencils, erasers, rulers - marking them individually as lucky or unlucky. I created a providential pencil case that had 2 broken erasers, short blunt pencils, and a pen whose wrecked, nodding cap made jingling sound all through. I passed that exam well, and the pencil box became my favourite lucky charm!

In those days of growing up a lot of people had rights to admonish, reprimand or pamper. Grandparents, uncles, aunts, cousins, neighbours all had say in our lives. They would all want to know when is the examination, how I did in the exam etc. Once the results were available, my grades were like public domain. It was like an URL everybody could access. A lot of social worth depended on it. If results were satisfactory I had the chance of being pampered. If not, everybody in hierarchal order admonished.

With the passage of time further examinations came along. To my unconscious mind I had started associating colours with good luck. While I prepared for my B.A. Honours exams I had a white-saffron face towel on my study table that I used to wipe my hands, mop tea that I spilled etc. The ivory-white background of this small towel somehow started providing hope, aspiration, purpose in that little study-table-world of mine. I got into the trend of wearing white clothes on the day of examinations. Till today, I have maintained it.

A friend of mine had narrated a story about an acquaintance who flew to Gibraltar because she was bored with mundane life. Not knowing what to do to enliven herself she threw her address book from a cliff overlooking the vast ocean. She was ready to start afresh. This is one scintillating story.....but I notioned the cheaper way was to enter student-hood again. I am in a foreign country. What better to learn their culture than entering an educational institution. The first week of University was fun, frolic, entertainment, amusement, parties. The younger students were wrapped in this frivolity. For the middle age students like myself, it seemed a carnival but without the tension of adolescent clothing desire or locker organization stress. But what I had forgotten was that I was becoming a regular student at an irregular age. The qualities of concentration, comprehension, memorizing had by far faded now. First week of academics was like crossing the mountains for me. Had to read an article three to four times, but could still identify little as though it was in Hebrew. In class it felt like another hurdle jump to be alongside a forceful bunch of 23 year old students. They had memorized every important part of the assignment, were eager to contribute in every scholastic moves and readily brought up heated discussion 'Did Karl Marx cross-examine the perception of Hegelian Dialectic in requirements of humanity?'

As circumstances would determine, the bunch of middle agers like me huddled together for safety and haven. We were an interesting mixture of a Canadian entrepreneur, an ex military official, an accountant, and a one time student fundamentalist from Russia.....all of us were in our middle age and each looking for an advanced doorway into the new-fangled world. There was one big revelation we all experienced. Each one of us was established in our own field, yet nobody has ever heard of us. But undaunted we started to figure out strategies that could aid us. After all, it was a silent battle of the young versus the mature. Our mission was to achieve the credential that will mark a distinction between what can be achieved and what has been achieved. To a young graduate the degree paper is a mere proclamation of aptitude, but for us it was the representation of a unique journey through 'terra ignota' or the expanse that has not been mapped or documented.

Exams were done, results were published. As I looked at the piece of my happily achieved Graduation paper, I realized that I still carried the providential pencil box, wore white clothes on exam day and revised since early dawn. Nothing has changed. The age old fright of exam, stress of studying, pressure of revelation was all there. Age can advance, location can change, scenario may get overturned but the habitual of my norms remain unaltered. At the end, my exam habits and superstitions passed.....and so did I ! ■

HONEYMOON

- Sakuntala Panda

Sushama was tired after climbing the steep, mountainous path and walking on the vast track of sand on the seashore. She sat down on a stone fully exhausted and looked at Naresh strolling happily a little distance ahead. Sushama did not like to call him back, because she knew that it was a habit with Naresh to walk very fast. Even during her early years of marriage, when she was slim and smart, she could not keep pace with him. And now after thirty years, she had put on so much weight that matching steps with the still sprightly Naresh was out of question. She stopped and looked around. A huge stone block looked very inviting and she lowered herself on that. She wouldn't have done that on such an isolated stretch of land, but today she was not wearing any gold ornament or had any money with her.

This was a new place for them. So as a measure of caution she preferred to wear only a few ordinary glass bangles and a chain made of coral beads. Her expensive purse was carefully concealed in her suitcase, in the locked hotel room. Moreover she never felt the need for money as long as Naresh was with her. He was ever willing to meet her monetary demand however frivolous it was. But then, she complained, not even a pan was available here which she so dearly loved. Oh well…

Naresh stopped near a hawker, who suddenly materialized selling roasted peanuts. As he purchased a packet from him and started munching, he realized that his wife was nowhere nearby. He looked back and spotted Sushama on the rock.

"Are you tired? Well, take a little rest and start walking slowly."

This was unnecessary advice. Sushama was always very conscious of her heavy body and made sure that she took her steps slowly and carefully while walking. A few metres ahead, it was the crowded seashore and Sushama did not want to tumble making a huge spectacle of herself. But why was Naresh suddenly so concerned about her, Sushama thought with mild annoyance. Couldn't he envisage Sushama's need? Couldn't he bring at least a packet of pan masala knowing fully well that it was impossible to get a piece of pan in this far-off place? Sushama somehow managed all these days with the most minimum use of the bunch of pan she got with her while leaving home. Her precious stock was now almost exhausted and she was restless.

"But why do you waste so much money staying in this costly beach resort?"Sushama complained.

"Don't you enjoy the scenic beauty of the place?"Naresh asked.

"Sure." Sushama ended the conversation.

She did not like to prolong any dialogue that could possibly become an argument. She failed to understand how someone would have this kind of wanderlust, when during the long span of his service career he had the chance to see so many places in the country and outside. Naresh's jest for travel had not been satiated. The only place that had any appeal for Sushama was the unadulterated natural beauty of her village and of course, a place with some religious significance.

Once when she was travelling with her husband, she had proposed to spend an evening in a temple where they could spend some time and pray to God for the wellbeing of their sons, daughters and grandchildren. Naresh had burst into boisterous laughter.

"This is a touristy town, not a place of pilgrimage. How can we find a temple here? God is everywhere and in your heart too. Meditate and you'll attain salvation." Naresh had replied in a light philosophical tone and lovingly added, "Come on Sushama, don't be silly. Relax and enjoy. Let us go to a nearby restaurant and spend some good time there."

Sushama did not mind going to restaurants, but she could not relish food served with a festive flair. That was also the case with the current trip. Long eight days had passed since they left home. Her heart was pining for rice, mashed potato and fish curry cooked with mustard paste.

She did not voice her yearning, because that would have really upset her husband. Naresh had had a very hectic and busy work life with no time to spare for the family. Sushama remembered how he would come home late at night after a busy work schedule in the office, sit near the TV listlessly, barely talk and unmindfully pick at the delicious food so fondly cooked by Sushama. It was a tiring life.

A few months after their marriage Naresh once fondly declared that they must spend a month's vacation in the hill station of Darjeeling. He applied for leave, which was fortunately granted. Sushama was thrilled as she always lived in a village and had never seen the outer world. But suddenly Naresh's father became seriously ill and being the eldest son he had to take the entire responsibility of his father's treatment. Moreover, he had to look after the arrangement for his sister's marriage in view of his father's illness. The programme for Darjeeling was cancelled and instead the leave was utilized for his father's treatment and his sister's marriage.

Naresh was disappointed that he could not take his newlywed wife for a vacation. A year later, he again wanted to take Sushama with him to Bombay where he had to go on an official work. Train reservation was done and they were to leave in a couple of days when Sushama's mother strongly opposed her long journey as she was expecting her first child soon. The trip had to be cancelled. Yet neither she nor Naresh was disheartened. They were rather thrilled with the prospect of their being the proud parents of their first child.

In course of time a son was born in the family. Both the parents were happy beyond measure. Sushama took the utmost care of the newborn child. Once Naresh forced his wife to accompany him when he went on official tour to a lovely hilly place. Sushama was reluctant at first as she had to manage the little child. But because of Naresh's persistent loving entreaties she joined him on his tour. But the pleasure unfortunately turned to be a nightmare as the baby could not stand the strain of the journey and got sick. There was no doctor at hand to treat the ailing child. Sushama became desperate and the tour was curtailed immediately. They had to come back. Thereafter Sushama promised never to be so romantically adventurous.

Years passed by. Sushama had become the mother of three more children and it was a busy family life with all its joys, woes and responsibilities. Naresh had got promotions with more important assignments and greater duties. He had no time to look after the family affairs. Sushama had no regrets. She was a loving mother and a dutiful wife. But she was only sorry for Naresh who in spite of his sincere desire, could not go out with his wife on a vacation ever.

The children grew up. Their eldest son was an Engineer in a reputed firm. The second son had completed his studies and right now was an internee in a multinational Company. The two daughters were married and also well placed in life. Their family life was quite happy and enviable. And finally Naresh retired from service honourably. He was now free and

his mind traversed back to long thirty years. He and his aging wife, Sushama, had ultimately come on a holiday trip.

"Can't you walk further, Sushama? Are you okay?"

"I'm fine. But look, how uneven the road is!" Sushama complained. "Well, did you manage to get the pan masala for me?" That was one thing, which was foremost on her thought.

"They don't have the stuff you wanted. Here is something else instead. But tell me something … why do you use it? Don't you know it causes throat cancer? Rather enjoy the peanuts I got from the beach. It is fabulous."

Naresh passed on the half finished packet to Sushama. She put only a few nuts into her mouth. It was hard to munch the nuts as her two teeth had fallen and two more were shaking painfully. Soon after they reached the hotel room, Naresh hastened to the bathroom while Sushama stretched herself on the bed without changing. After a quick bath Naresh was ready with his best dress and asked Sushama to freshen up in no time.

"Do you have any special plan for the evening?"Sushama asked jokingly.

"We'll go to the terrace garden, have chilly paneer and then go to the nearby hotel to see the Folk Dance."Naresh announced with evident pride.

"Why waste so much money? We have visited many places all throughout the day. Why not sit down for some time and watch the TV? They have a nice serial now."There was a mark of feeble protest in Sushama's voice.

Naresh was visibly disheartened. The film music he was singing in an undertone stopped abruptly. Sushama was a loving and ever understanding wife. "Okay, let's go. I am ready," she said.

They were walking on the crowded road. It was a colourful evening. Naresh stretched his hand in a bid to hold Sushama's. But as she hesitated, Naresh chided her affectionately. "Oh, come on! See how many people are walking hand in hand." Sushama merely smiled.

They had their dinner in the hotel. Sushama was so tired that she was in the bed in no time. Naresh was sitting alone in the balcony. He shouted, "Hey, what are you doing? Why don't you come and see the beauty of the moonlit night?"But Sushama was too sleepy to respond. After a few minutes Naresh too closed the door and chose to sleep as they had to get up early the morning to see the sunrise on the sea shore. He called Sushama softly, begged an apology for awaking her up and started to discuss their programme for the next day. It was a long and ambitious plan.

"What is your age now?" Sushama asked without context.

Naresh was not at all embarrassed. "Didn't you see in the paper that a reputed film star of Bombay got married at the age of sixty? I'm one year younger, you know," he added proudly.

"But who prevents you from marrying now?" Sushama joined.

Naresh became pensive and remarked, "All throughout my long service career I had tried to get leave and go out with you for a vacation. But it was never possible. Now that I am retired what is the harm in fulfilling my long cherished dream?" After a short pause he added, "Let us not always consider the age while trying to live a life."

Sushama was sorry for hurting the feelings of Naresh by her impertinent remark. She consoled remorsefully, "You have worked all throughout your life sincerely and efficiently. You have never neglected your family and by God's grace all our children are now well placed in life. You too have attained the highest position in your service. God has given us everything. You are now retired and there is no worldly responsibility for you now. So we can go to any nice place you like. I like your company."Naresh had no comments and they slept.

Very early in the morning Naresh rushed to the sea shore to see the sunrise. Sushama followed him reluctantly. She was really tired of the long walks on the sands of the shore and the sunsets and sunrises during the three days of their stay in this beach resort. Unfortunately it was a cloudy morning and they could not see the sunrise. They returned to their room. While they were having tea in the balcony, Sushama revealed that she had a nice dream the previous night. "We are in a big temple and there are a number of gods and goddesses. I was offering flowers to the deities ……But the dream vanished. Well, can't we go to some places of pilgrimage during our tour?"

Naresh did not reply, but rather suggested that they should visit a number of hotels during their stay there to enjoy a variety of food from different parts of the country. Sushama was amused at this strange proposal because at home Naresh had no time or inclination to relish any delicacies she so fondly prepared. After a little pause Naresh added, "This evening we will go to see a picture in the cinema hall. They say it's a nice film. Haven't you seen the big posters pasted on the outer walls of the hotel? After seeing the picture we will have our dinner in that big Five Star hotel where their continental food is fabulous."

Sushama could not remember a day when Naresh ever went to see a movie or a theatre. The zest for life should have plateaued by now. But here he was planning each minute of a day and salivating for the sizzlers, the roasted lamb or the chicken Manchurian. Sushama would have liked to just relax. But she did not oppose the grandiose plan Naresh so heartily made. It was their last night in the beach resort. Sushama heaved a sigh of relief.

They came back to their room after seeing the film and eating dinner at the Five Star hotel. They were sitting in the balcony. "Tomorrow in the morning we will catch a bus to Bangalore. We'll stay there for three days," Naresh announced with pleasure. Sushama did not seem elated. "When shall we return home?"She asked. Naresh was a little perturbed. "If you visit different places your mind and body become fresh and energetic. Why do you always think of going back to the life of woes and worries which we have lived and suffered for so many years?"

Sushama did not utter a word. Her mind was restless. She was tossing her head in the bed in desperation. Naresh had no sleep. He was looking at the star studded sky through the glass window. He came closer to Sushama and touched her endearingly. "I came to Bangalore when I was in college. It is a garden city whose natural beauty is beyond description. During thirty years of my service career I could not bring you here even once in spite of my great desire. This time we will not only see the various lovely places in and around Bangalore, but will also go to Mysore and the neighbouring hill stations. I have never purchased a silk saree of your choice in my life, but this time we will get one for you from Bangalore. Hey, are you listening to me or fallen asleep?"

"No, I'm fully awake," said Sushama. "By the way, we must take two silk sarees, one for our daughter-in-law and the other for our elder daughter Bani. Our younger daughter Jitu may like a silk Salwar and Kameez of good quality. We will find out from some big shopping Mall or government emporium." After a little pause she added enthusiastically, "Well, they say that the quality of stainless steel utensils is the best in the South. So we must take a full dinner set for Jitu, whatever might be the cost."

"What about your grandchildren, Jit and Baby? Nothing for them?" Naresh teased.

Sushama was full of cheer. "Oh, I haven't told you. During our stay here I have collected quite a good number of toys of different kinds and hidden them carefully in our suitcase. How can I tell you how much I miss them? We must go to Bani's house and see the two little babies before we return home. You promise, please."Sushama implored.

There was no response from Naresh. He was perhaps fast asleep. ■

The Morning

- Suparna Bose

The day started at 7 am, as usual. The phone alarm ringing the familiar signature Verizon tune, followed by blindly groping for the phone and the sound of an invisible item, falling on the floor, the sound muffled by the carpet. That could very well be the iPad...she groaned and opened her eyes. The room was dark, that was how Brent liked it and left it, in the morning, when he left for his office. She got up, and switched on the light. It did not work. Of course, she was supposed to have replaced it yesterday and she had forgotten. She reached for the bedside lamp on Brent's side of the bed. Yes, that was working. Now, she had to switch it on.

The light flooded the room. She shielded her eyes and groggily walked to the bathroom, splashed water on her face. The phone alarm rang again, ding-ding-ding-ding-ding-ding. She walked out of the bathroom, came out of her bedroom, crossed the landing, and entered her daughter's room. It was dark as well, they all liked to sleep in pitch-black darkness. She again blindly groped her way towards the window and pulled up the blinds. Light flooded in, followed by a muffled howl from the bed, "One more minute, please, Mom!"

She came out and went down the stairs. She went into the kitchen, took out the bread from the fridge, and put it in the toaster, took out the strawberry jam and eggs and set the table. Cathy liked her eggs soft and runny, so this week, for the first time, she had bought pasteurized eggs from Kroger. Oh, the fear of salmonella poisoning! She looked at the clock. It was already 7.10 and Cathy always needed at least a half hour to finish her breakfast. She left the kitchen and climbed up the stairs, went into the bedroom, and trilled, "Your one minute is up, young lady!"The "young lady" emerged from the Justin Bieber comforter, one eye closed, her smile showing a recent gap where a canine tooth had recently fallen. Oh, how she grew up, so fast, too fast! Cathy stumbled into her snuggly, furry, cuddly slippers and walked to the bathroom. She walked out of Cathy's bedroom, walked down the stairs, and back into the kitchen, switching on the stove, putting the frying pan on, letting it heat, then splashing some cooking oil on it, while she mixed the eggs, with salt, pepper, and Italian seasoning, just as Cathy liked it. She heard Cathy scrape the chair back as she sat in her usual place. "Could you please set the table for me?"The eggs were ready, scrambled but soft, almost on the verge of being runny, the golden yellow goo ready for being mopped up by the lightly browned toast, just as she liked it.

She put the coffee filter in the coffeemaker, poured some ground coffee inside, and poured the water. Soon, the aroma would be all over the kitchen, and she would have her peaceful morning cup of coffee, feel the caffeine run through her, and hear an inaudible 'pop' inside her brain! She loved this! Cathy was excitedly talking about her play-date in the afternoon with her best friends, Melissa and Haley and Ginger, and Mommy must keep the kitchen stocked with juice, goldfish crackers, and must bake her signature cookies. Oh, that meant she had to cut her coffee short and go to Kroger for grocery shopping! Oh, well, that's okay, she thought, I'll just walk her to the bus stop, come back home, finish off the rest of my coffee and then drive to Kroger.

"Mom, I'm done!" "That was fast, honey," she was surprised. Did the 30 minutes pass so fast, or was she just day-dreaming? May be, Cathy was growing up, she was nine now. "Sweetie, it's almost eight o'clock, so hurry up, the bus has been coming early the last couple of days." "Come on, Mom, I'm always faster than you," came the cheeky reply. Hmmm, she really took her time getting dressed, dear Mama (bless her soul) always said. She went up to her room and took out her everyday pair of jeans, paired it off with a teal scoop-neck long sleeved tee shirt and grabbed her moccasins. Cathy was waiting for her at the bottom of the stairs, with an 'I told you you would be late' look replacing the smile on her face. Oh, there we go again, I don't want a row so early in the morning, she groaned inwardly. "Let's go! What are we waiting for, anyways, you don't really have to come with me to the bus stop every day, it's soooo annoying..."said the now-frowning Cathy.

Hmmm, the girl is definitely growing up, a surly, unsmiling teenage face lurking behind the smiling nine-year-old one and emerging regularly nowadays. Children grew up so early, and a pre-teen behaved more like a teenager. And, not just in her family, she had observed it all around her. Things were changing too fast, she sighed. The digital age children, who chatted with friends online, stood at the bus stop and texted their friends at the next bus stop! She received a poke in her side from the pre-teen and groaned. "Come on, what are we waiting for", whined the familiar voice.

"Okay, okay, let's go". They rushed out of the house, just slamming the door shut, not bothering to lock the door, as they always did. And ran to the bus stop, as they always did. The pre-teen, now suddenly sunny and smiling, was joined by too other giggling pre-teens, "Why are you always late?""Oh, it's just because of this person, you know, who's always daydreaming... she can be like soooo over-protective and annoying, my mom, you know!" Cathy replied archly. She was hovering in the background, caught in two minds, eavesdropping and wanting to ignore their conversation, oh, how was she going to tolerate the next few years, she hated these confrontations every morning, every evening, every night, during drop off times, and coming home times, breakfast and dinner... The bus had come. Cathy stood in line, pointedly ignoring her. She sighed, Cathy would be in a better mood when she came back from school. In the afternoon. The bus left. She walked back towards her house, she could go back to her coffee dreaming session now, for another two hours now. This was her time, for herself. She opened the door, went in to the kitchen, poured a second steaming cup of coffee, grabbed a Danish from the fridge and switched on the television. This was ABC news time. Mmm, yummy... the sweetness of the danish, the bittersweet strong aroma of coffee, the drone of the announcer's soothing voice...

...She must have dozed off for a bit...the announcer's soothing tones were replaced by a more urgent one.... "We are announcing a shooting in the premises of ... Elementary School... Eyewitness accounts reported a number of fatalities... exact nature of the accident not known. Please stay with us for more news....

She stood up, and blindly groped her way towards the door, as she did every morning, as she groggily woke up from her sleep. That couldn't be the name of Cathy's school...she must go there right now...she opened the door to the garage...mechanically opened the garage door opening switch, got into her ford and drove out to the school. There were cars and cars all around, no space in their parking lot. She parked the car into the church parking lot opposite to the school. She met her high school friend Judy, her neighbors Rana and Tom and Derek, her mother's friend Rita and then

Continued on page 57

Neta Ji "Bose"

The Father of Indian Independence

- Rohan Agrawal

Bengal, an important part of India that has given series of visionary leaders be it Swamy Vivekanand, His Divine Grace Srila Prahupada or Neta Ji – Shri Subhash Chandra Bose. Interestingly almost all of them had special connection with the land of rising Sun – Japan. The vision, the confidence, the exposure being given by Swamy Vivekanand Ji towards the end of the 19th century was put into execution by two bright Bengali classmates (@Scottish Church College) who arrived in this material world just a few years before when Swamy Ji left. Both of them having good command over English as well as having deep understanding over the spiritual essence of life. One took the task to spread spiritual enlightenment in the whole world and other took the task to boost enormous confidence among the dejected Indians & change the Indian history forever. It is indeed an irony that while one helped (& helping via his books) billions to understand the mystery of life, other left his life – mainly his disappearance with full of mystery. Last year we had recalled the brief biography of HDG Srila Prabhupada in Anjali, this year we will touch some important aspects of Neta Ji.

Did Neta Ji believe in Spirituality?

Handsome leader with confident looks being decorated in the army uniform is a typical image which present generation seems to have for Neta Ji. Neta Ji was a leader who always led from front, be it a round table conference or a war field. However if we closely follow his daily routine, his quotes, his speeches, one cannot hesitate to categorize him as a "Spiritual leader". Here is one of the famous quotes from Neta Ji that can justify both these images:

"A true soldier needs both military and spiritual training"

Why Neta Ji is the father of Indian independence?

After successfully crushing "Quit India" movement and by winning WW-II, Britishers were only aiming to expand their rule in south-Asia. What they could not expect was one of the biggest revolutions that kicked-off in 1946, known as Royal Indian Navy (RIN) mutiny & Royal Indian Air Force Revolt (RIAF). RIN & RIAF mutinies were triggered by Neta Ji & INA's fight during the siege of Imphal. It is worth mentioning that recently National Army Museum in England has rated the battle of Imphal-Kohima as the "Greatest British Battle". Even with a win, British army was never like before and was left with exhausted British airmen who also inspired RIN & RIAF mutinies. British PM Clement Attlee mentioned that Neta Ji's INA & RIN made Britishers realize that they were no longer in a position to rule India.

How can Neta Ji inspire us even today?

Swamy Vivekanand Ji had always mentioned that one who forgets his history cannot create his future. Solution for "today's problem and development for future" also lies in history. It is the "devotion for a queen" among Indian soldiers that was broken by Neta Ji which eventually led to Indian independence. Once again we need a leader who can inspire us, can boost the confidence among the dejected Indians, that India can also become a "developed" nation. It was the feeling of "Nationalism" being ignited by Neta Ji to unite all the Indians for "Swaraj" (freedom), once again we need to re-energize the feeling of "Nationalism" to get united for "Su-raaj" (good governance). To justify this, here is another quote by Neta Ji: "Nationalism is inspired by the highest ideals of the human race, Satyam (the Truth), Shivam (the God), Sundaram (the Beauty)."

How to resolve the mystery behind Neta Ji's disappearance?

Mukherjee Commission, majority of the Neta Ji's family members & other prominent researchers on Neta Ji, they all had one thing in common – tones of facts & evidence that clearly question the theory of suggested air-crash in 1945. So what happened to Neta Ji and where was he post-1945? We do have answers available but they are sealed into some ~27 files being marked as "de-classified" and are possessed by the Governments of India, Russia, Japan, UK, US, Germany & Italy. Hence only way to resolve this mystery and to get the justice for our National Hero is to release all the declassified files related to Neta Ji in the public domain. Recommended reading for details: "India's biggest cover-up" by Anuj Dhar.

Neta Ji's followers in Japan:

Neta Ji will always be remembered as an important milestone for Indo-Japan relations. Neta Ji has always received the greatest level of respect from Japan and even today he is being revered with great extent. In 2013, Tokyo had a memorable birth anniversary celebration for Neta Ji. This includes re-union for Japanese INA veterans, short movie on Neta Ji's rare photos & videos, message from Dr. Swamy and kids reciting poem on Neta Ji as well as performing regimental quick march on INA's Qadam Qadam Badaye Ja. ■

Lukewarm

- Sumon Chattopadhyay

For the past couple issues I had focused on the topic of identity being an international kid growing up in Tokyo, and hence this time I had tried to steer clear thinking I was beating a dead horse writing about it. I was planning on writing about ultimate frisbee, my favorite hobby that I picked up while studying in the States, but spending time with the ones you care most about tend to mess with your priorities. I also just had an urge to write about this, which rarely happens.

Recently I've signed up to stay in the United States for another four or five years, hopefully coming out at the end with a PhD in Chemical Engineering. At the time when I was presented with this opportunity, it seemed like a no brainer. However, as I look back, I've come to realize that I had been struggling with the decision ever since I decided to attend college in Baltimore, and will continue to do so for the rest of my life.

Deciding to take the offer to pursue a PhD wasn't just about whether I was willing to stay in school for another five years. It was also about whether I wanted to continue living in the United States. It involved deciding which continent I wanted to launch my career in, or to postpone it altogether. It was about whether I was willing to be a 24 hour plane ride away from my home and family for another five years.

From what I've gathered these past five years, for most people, home is suburbia. Home is farmland with maybe two or three crop types. Home is where you graduated high school with a thousand other people, of which you actually hung out with maybe ten, the rest being your mortal enemies or of zero significance. Home is where that girl you took language arts with is now a mother of three. Home is where the only hang out spot is the mall, where the entire town congregates.

My above statements are very biased and generalized. For these people however, going back home after graduation was not really an option. For them, going to college was their ticket to escaping home, to move onto better opportunities.

As for me, it was definitely not as clear cut. I must admit: it took me awhile to figure out why I had gone to college abroad. This is because home for me is Tokyo, a megalopolis of roughly 13 million people, a global city that is the center of finance and commerce, Japan's gateway to the rest of the world. Tokyo has multiple national universities and many more private ones, welcoming millions of new students every year. There even exists a special Japanese word for "moving to Tokyo" (上京, joukyou) because that is the expected flow and natural decision for most people in Japan. Tokyo is the center of opportunity, the hub of education, the focal point of the Japanese economy. It is only natural that most people flock to this city in order to carve a piece of their own.

Growing up in such an environment abundant with choices and opportunities, it is no wonder that I had such a hard time justifying to myself that I should not move back after I was finished with my college education.

It did not help that I got to fly back to Japan for three weeks to see friends and family (and renew my visa to stay in the US, but that was more of an excuse to convince my professor to give me time off). I had been fortunate enough to be able to fly back twice a year during my major breaks consistently for the past five years, thanks to my parents who are willing to pay for the expenses to shuttle me back. Multiple times I had needed these short trips back in order to recuperate, rejuvenate, and recover from a sometimes grueling, demanding, and emotionally taxing semester. For me, Tokyo was an energy source that allowed me to recharge my batteries that Baltimore drained off so quickly.

I had also been fortunate enough to enjoy traveling within Japan extensively, whether it was with my family or with my friends. Last summer I had the opportunity to travel to Fukuoka in order to see a good friend of mine and also play in an Ultimate Frisbee tournament, and later travel to Osaka to watch Ultimate Frisbee national teams from different countries compete for the gold medal (you can tell how passionate I am about this sport). I then capped that summer with a short trip to the Shirakami Mountain Range, a world heritage site spanning Aomori and Akita prefectures that I described in an earlier issue as "soul-cleansing". The following winter my family took me on a weekend trip to Okinawa, driving around the island

enjoying the 20 degree Celsius weather instead of freezing back in Tokyo. This summer, I had the chance to visit and relax at the hot springs in Naruko Onsen as well as drive to another world heritage site, the Historic Monuments and Site of Hiraizumi. While visiting the gorgeous Buddhist temples and being overfed with authentic Japanese cuisine, I began wondering why I had decided to stay in Baltimore when I could be enjoying ramen and taking baths every day.

The epiphany did not hit me until I was back in Baltimore to start my 6th year of school in the United States, after the first day of class. I was already feeling overwhelmed from the class materials, exhausted from trying to decipher the professor's impossible accents, stressed about the unaffordable prices of the textbooks, worried that my paperwork for my stipend had not gone through.

None of these feelings I had ever associated with Tokyo. They were always associated with Baltimore. For the past five years, I had nothing to do in Tokyo that would drain my

batteries. Baltimore was taxing to me because, well, I was challenging myself here, and stepping out of your comfort zone to grow yourself can be very tiring.

Of course, there are the technical reasons like Tokyo not having any pharmaceutical research jobs or it being impossible to get a research job in the United States without a PhD that ultimately led to my decision to not head back. There were multiple people in Baltimore that made me feel welcome here and made me want to stay for a while longer. However, it ultimately came down to the fact that I felt that I grew in Baltimore, and that this city provided even more opportunities for me to continue developing myself in many ways.

As for the city of Tokyo, well, let's just say that maybe I feel too comfortable there. Lukewarm might be the best adjective. I know myself too well to realize how lazy I would become in familiar settings.

I am scared, I will not lie. I am scared of being at the other side of the world from home. I am scared of being a 24 hour plane ride away from my family. I am scared that here in Baltimore, I am essentially on my own. I am scared that if anything happens, I will not be able to react to it quickly enough. But these fears are simply trade-offs to the enormous untapped potential both within me and in Baltimore.

And thus, I finally convinced myself that staying for a PhD was the right decision.

This reminds me a remark my high school guidance counselor made when I was complaining to him about how hard it was to choose the one single college I was going to attend. He said,

"No matter what you decide to do, you're going to regret it later. It's about whether you can make the most out of the decision you made."

And that is exactly what I am going to do. ■

The Morning ... *Continued from page* 54

she couldn't count any more...the faces were blurred with tears, mascara, and lipstick, smeared with wrinkles and sobs.... tears running down cheeks and tee shirts, like rain running down the roofs...she saw Cathy's friend Ginger's mom, crying like her...why wasn't Ginger here...oh wait, she was still in class...so was Cathy ...she would give Cathy a hug when she came out of class, running...she had forgotten to hug Cathy in the morning before she left the house...waiting for Cathy ...waiting...

...when Brent reached the school premises, an hour later, she was still huddled on the sidewalk, softly crooning to herself, "You are my sunshine, my only sunshine...".

Mornings would come and mornings would go, but the morning sun would never be warm enough. The sunshine was gone.

Forever. ■

‘Alu Posto’ and the Strange Visitor

- Tapan Das

It was ‘Maha Ashtami’ and as usual we all had assembled near the ‘Puja Pandal’ to offer our prayers to ‘Devi Durga’ and one round of anjali had just concluded when my eyes fell on a young girl. She was still offering her prayers but with a different posture. She raised both her arms with palms open and head bowing down, as if invoking the Goddess. This unconventional posture reminded me of reading somewhere that the worshipping methods of Greco-Roman deities and those of the Hindu pantheon had many similarities.

The dusky girl probably was of 15 or 16 years of age, she had sharp features with deep large eyes which attracted me the most. Though not very beautiful, her face had an aura which made her stand out in the crowd .She was wearing a simple white saree with a red border. It was clumsily worn, as if it was her first attempt to wear a saree. Suddenly her eyes fell on me and I felt a bit embarrassed – she might think that I had been staring! I looked away, but my thoughts were still revolving around the stories that I had read about a particular Greek race who offered their prayers to the Sun God in a similar manner.

As I was manning a particular gate as a volunteer at the pandal, she approached me and asked me if she could have ‘khichuri bhog’ (prasad) at noon for free – or should she pay for it? ‘No no you can have the bhog for free at 1 pm ma’, I promptly told her. ‘Thank you uncle’, she replied. Her Bangla had an accent, a typical anglicized flavour . However, I could see that she wanted to say something more. As Suman relieved me at the gate, I thought I should go and talk to the girl and find out more about her. I was curious.

She was nowhere to be seen. Her peculiar large eyes began to haunt me and I was sure that her face was trying to convey something which I had failed to decipher.

I took Saachi, my daughter, along with me and started looking for her and at last found her sitting under the pandal alone, at a corner where the cultural competitions were about to begin. We went near her and asked, “Hello Ma! Can we sit here and talk to you for a minute?” “Sure Sir,why not?’ She introduced herself ‘I am Shyama, Shyama O’ Blair’. “May I ask you about your whereabouts?” I enquired. ‘Sir my father was from the UK while my mother is from Bengal,’ She continued, ‘however we were brought up in Greece and then in Burma by my Aunt.’ I was fascinated by this story.

‘Some say that my father had embraced Hinduism secretly and became Jatindranath O’Blair from Richard Blair. He is no more, sir.’

‘What happened to him?’ I asked

‘We all settled at McCluskiegunj, a British colony in Jharkhnd. My father wanted to find out more about his grandfather who was posted in India and was in the Indian Civil Services.’

‘During the British period ?’ Saachi asked inquisitively.

‘Yes. He was also researching on the opium trade by the East India Company. The highly addictive drug made from ‘poppy’ seeds was sent out to other parts of the world by his grandfather’s department. Probably, we Bengalees started taking ‘posto’ from that time onwards! But one fine morning he just disappeared and nobody seemed to know anything about him. We stayed back in India with my mother at McCluskiegunj. You know uncle, still a number of Anglo Indians and British families reside there!’ ‘But we all like Alu posto’, she added smilingly.

‘Have you eaten anything since morning?’ I enquired.

‘No sir, I wanted to offer Anjali first,’ she replied. Her voice was low.

‘Do you have money with you?’

‘Yes sir, I have a 10 rupee note, but I have to catch the bus to Hubshiguda where I stay with the Sarkar family.’

I could see tears rolling down her cheeks. I took her to the nearest food stall and offered her something to eat and some sweets. She was very happy.

‘Sir, you are a good man. Thank you. I must say that you remind me of my father. He used to have a Punjabi just like the one you are wearing. He was fat and heavy built like you, sir.’

‘Oh! I see,’ I smilingly replied.

‘What do you do?’

‘I work as a baby sitter but I don’t like the job,’ she paused and continued in an aggressive tone, “I live the life of an animal. It is miserable and it is slavery . . .” Can you help me, Sir? I want to go back to my mother and start studying again. I told mom not to worry as I can teach and earn some money. I have completed class xi but had to discontinue as my mother retired from a school where she had to work as a caretaker of the hostel .Being poor, all animals are equal… I had to come here for work.’

Her aggressive words reminded me of some fiery speeches of revolutionaries. Who is this girl really? I asked myself, her words are very familiar and yet mysterious.

On the loudspeaker we heard the announcement that the cultural competitions are about to begin. The girl suddenly stood up and pleaded, ‘Sir, can I also participate?’

‘Yes you can,’ I replied.

‘Thanks again, Sir, I do not know if I can come tomorrow or at Dashami. But will they offer me money in lieu of prizes if I win the competitions?’

‘The Organizers may, but why do you want money and not prizes?’

‘Sir with that money I can buy tickets to go home to my mother.’

I understood the poor girl’s state of mind and decided to buy her a train ticket myself.

‘Don’t worry. I shall buy you a ticket tomorrow but won’t your employers object to this.’

‘No! no! no need to tell them as they will never understand me sir, I will buy a ticket myself. Will you lend me 500 rupees? I shall return the money by MO.’

‘Yes! Yes! I will but you need not return it.’

‘No sir, by the grace of ‘the Great Cybele’ you will get back the money for sure.’ she said pointing towards the image of Durga.

I took out seven hundred rupee notes and gave it to her.

‘Thank you sir but I only need 500 rupees.’

‘You keep the money. You will need it, ma.’

My daughter gave her anther 500 rupees from her pocket money. She took a pen and jotted down my phone number and postal address on one of the hundred rupee notes. She then took out her 10 rupee note and scribbled her telephone number on it. She also scribbled the following lines: ‘A Clergyman’s

daughter thought of shooting an animal in an elephant farm in 1984 during the Burmese days. . . .' The lines did not make any sense to me. But I did not question her. I requested Sunaina and Roma to put her name as a participant for various competitions and told her to have 'bhog' at 1.30 pm and enjoy the Puja.

Around seven in the evening, when we had assembled for the evening puja, Roma,Prateek and Sunaina came running to me.

'Uncle you know what happened?'

'What' I asked.

'The participant Shyama you referred to us this morning!'

'Yes yes what happened to her?'

'Nothing happened. She was just wonderful, awesome, amazing, brilliant . . .'

'You know, she won all the four first prizes'

'I can't believe this, ma!'

'The guest judges were mesmerized by her eloquence.'

She recited Kalidas Bandopadhya's poem 'Hat' with such eloquence that it won the hearts of everyone. She sang a Rabindro sangeet and also its English rendering which won her the first prize again and at Antakshari she was unparalleled too. Even at the debate she just tore apart her opponents with her forceful oratory. We never knew that the Children's rhyme! "Ring-a Ring-o' roses, A pocket full of posies, A-tishoo,! A-tishoo! We all fall down" actually talks about the great plague of England, where people developed rings like reddish sores and rashes all over their body and they coughed making a noise similar to 'A-tishoo! A-tishoo! and all fall down' One by one people died of plague in spite of having pocket full of medicines. She is a genius, Kaku, she is a genius. She has left a note for you stating that if she wins any prizes they may be handed over to you .As we chatted with her she said that while we may call the idol Durga ma, her grandmother called this goddess "Cybele-The Mountain Mother" who rode a lion driven cart and was known as the Great Mother or the Goddess of Fertility in Rome .All most everyone from our young brigade like Misha, Amrita, Srija, Siddharth, Tanima, Torsha and Saachi had literally become her fans instantly and later Kapil, Babban, Riu, Sukriti, Atashi, Abhishek, Himanish, Kinshook, Suraj, Nitisha, Shuva, Tiklu, Veeresh, Digby, Anindit, Sagnik, Shreya, Asmita, Srimoyee and Ritu joined them. Can you imagine her popularity Kaku?'

******

Navami passed by and Dashami was in, but I could not stop thinking about the little girl. On the Dashami day, it seemed to me that Devi Durga had left us early for her abode leaving all of us in tears. I still remembered that on the Ashtami day, after having bhog, she went towards the Idol and prayed in the same unique posture as she did that morning. Was she a British or an Anatolian or a Roman? I questioned myself. I still remember the way she had thanked me profusely.

The sound of Dhak boomed once again and it was time for Bisarjan. Those eyes and the tanned face of the girl were haunting me and my family. While Devi Durga was about to be put into the water, I could see Shyama's large eyes as if superimposed on the Devi's face.

Time passed and I almost forgot about the mysterious girl. During the Laxmi Puja day, prize distribution was being done along with some cultural function and we all had gathered for the function. Suddenly, my name was announced to receive the prizes on behalf of Shyama! Shyama O'Blair had won four prizes, I remembered. I was a little hesitant to accept the prizes on her behalf. When prodded by everybody I went up to accept the four envelopes from the Organizers. I decided to send the four envelopes to the girl's address.

After watching the concert I was sitting in a corner and waiting to have dinner. My daughter and her friends wanted to know what was there in the envelopes. When I opened the envelopes there were Rs 300 in each envelope – Rs 1200 in all. Oh My God! We had handed over the same amount to Shyama that day. What a coincidence!

I immediately thought of contacting Shyama so that I could ask for her address but she was not reachable and the number seemed to be invalid. On looking at the notes minutely, I saw something which I could not believe. My address and phone numbers were written on one of the 100 rupee notes. On one of the other notes it was scribbled, 'A Clergyman's wife thought of shooting an animal in an elephant farm in 1984 during the Burmese days,' and in the third note it was written, '... but could not do so as Comrade "Big Brother" was watching the 'Cold War'!. Suddenly the place was filled by the strange fragrance of the girl and I could sense her presence.

Slowly I began to solve the riddle and it came to me! Without any further delay I rushed to a nearby internet cafe. Yes, my guess was right. The search on Google showed that George Orwell, the famous writer, was born 'Eric Arthur Blair'. He was born at Motihari, Bihar in India in 1903. His father Richard Blair (Sr.) worked for the Indian Civil Services and lived with his wife Ida who was of a mixed origin. Shyama must have been the daughter of the adopted son of George Orwell, Richard (Jr). Possibly, Richard (Jr.) might have married a Bengali lady while in India or Burma and Shyama might have been their daughter. While trying to convey her identity, she had jotted down on the currency notes the titles of the books her Grandfather had penned and the words he had used – 'Big Brother' and 'Cold War' which have been immortalized later. How could I not understand this! 'Animal Farm', '1984', 'The Burmese Days', 'Shooting an Elephant', 'A Clergyman's Daughter' are some of the great books written by George Orwell who was a great novelist and a journalist, and I missed that completely!

But how did the currency notes which I had handed over to Shyama come back to me through the gift envelopes? Was the girl real or a figment of my imagination?

Suddenly I felt a nudge 'Get up papa.....your tea is ready, time for you to go thru Pritha didi's draft thesis on Orwell before you go to office ', my daughter Saachi was at my bed side with a cup of tea in hand. Oh my God! Was it a dream then? I murmured. ■

Thoughts on Attending
Independence Day Celebrations in Japan

- Brajeshwar Banerjee

The Indian embassy every year organizes a ceremony to commemorate India's Independence Day on August 15 and Republic Day on January 26. The ceremonies at the embassy start at 9 a.m. Since Japanese offices start at the same time and many schools too, it is difficult for a "salariman" (a Japanese term referring to predominantly male "salaried office workers") or parents with young kids to attend these embassy events on a working day. Some explanation may be useful here.

A very strict demarcation between personal and company activity exists in the Japanese workplace and attending private events on company time could be career limiting if discovered. Since taking holiday is taboo (it has connotations of laziness or lack of loyalty to one's employer) and bureaucratic, using part of the precious 10-20 working days of paid annual leave could be bothersome (although an Indian salariman is perhaps less strictly bound by the social conventions that apply to his Japanese counterpart). Many non-Japanese salarimen also save their annual leave for emergencies and trips back home. These reasons plus a lack of strong resolve on my part were why I had not attended any of these embassy events in spite of living in Tokyo for more than a decade. However, this year I finally took time off to attend the Independence Day celebrations.

I took a taxi from my office to the embassy. In the taxi, I was remembering the Independence Days spent in India - how happy I would feel that school was closed, how we would watch the flag hoisting on television, how I would then go up to the roof to put up a hand-painted paper tricolor of my own (or watch the headmaster raise it at the boarding school I attended later), how patriotic songs would be played on the radio, TV and also on loudspeakers at the local clubs. Men would wear starched white or khadi kurta pyjama and some would even don Nehru hats. I was awakened from my pleasant reverie when my taxi came to a sudden stop.

I noticed we were near the embassy but stuck in a sea of black trucks festooned with Japanese flags. Policemen in riot gear were barricading the footpaths on both sides of the road, the side roads were blocked with moveable steel gates and scratchy old Japanese songs extolling patriotism could be heard being played from the speakers fitted onto some of the black trucks around us.

"What has happened?" I asked my taxi driver – a middle-aged Japanese man.

"Oh, today is the anniversary of the end of the war sir", he said and indicated that the police barricades and the blocked side streets were aimed at regulating visitors to (and keeping out troublemakers from) the Yasukuni Shrine which was just across the Indian embassy on Yasukuni Dori road.

It then dawned on me that a day that for Indians is a glorious occasion to celebrate India's independence is actually a day in Japan to commemorate the end of the Second World War (*shusen kinenbi*) with all its associated miseries and the ignominy of defeat. It didn't help that our embassy is located across the Yasukuni Shrine on one side and a memorial for the war dead a short walk away on the other side.

There are a few theories on why these days coincide. The most plausible one is that when Lord Mountbatten was asked about a precise deadline for Indian independence from Britain, the date that came to his mind was August 15th.

Mountbatten was appointed as the Supreme Allied Commander of the South East Asia Command in August 1943. It was on August 15, 1945 at 12 noon in Japan that Emperor Hirohito's speech ending Japan's war was nationally broadcast (formally referred to as the Imperial Rescript on the Termination of the War and informally as the *gyokuon housou* or "jewel voice broadcast"). The day is marked as the Victory in Japan or V-J Day in many countries although Australia prefers to call it the Victory in the Pacific or V-P Day. South Korea celebrates its independence on this day and celebrates it as the *gwangbokjeol* or "restoration of light day" and North Koreans mark it as the *joguk haebang ginyeomil* or "motherland liberation day". In Japan the day is not a national holiday and the official name for the day is the cumbersome "*senbotsusha o tsuitou shi heiwa o kinen suru hi*" which stands for "day for mourning of the war dead and praying for peace" although most people, like my taxi driver, simply call it the more-easy-on-the-tongue *shusen kinenbi* meaning "the end of war anniversary".

It is interesting that even though Emperor Hirohito made the national broadcast on August 15, 1945, the formal surrender ceremony happened more than two weeks later on September 2, 1945 on board the United States' battleship the USS Missouri in Tokyo Bay (currently berthed in Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii, where it is a museum) when the Japanese Instrument of Surrender was signed which marked the formal end of the war.

The events of August 15, 1945 were clearly momentous enough to have made such a deep impression on Mountbatten that it even foreshadowed other key events such as the atomic bombings of Hiroshima (August 6th) and Nagasaki (August 9th), surrender by the Japanese of Burma (currently Myanmar) under his command and Mountbatten himself receiving the formal Japanese surrender of Singapore and South East Asia from General Seishiro Itagaki on September 12, 1945.

I got out of the taxi since traffic on Yasukuni Dori was hardly moving at all and started walking towards the embassy. Around me were many Japanese rightists in their faux military outfits, numerous black vans with patriotic slogans and flags painted on their sides parked bumper to bumper along both sides of the road, elderly men and women (fewer) dressed in somber colors (Were these former soldiers? Did they lose family members in war?), buses pouring out people (How far had they traveled and why?) and young men and women trying to shield themselves from the hot August sun (Are they just walking to an office nearby to go to work or going to the shrine?).

When I turned into the side street from Yasukuni Dori towards the embassy gate, the Indian tricolor was being hoisted outside. A group of people were gathered. There was clapping and waving of paper flags that were being handed out at the entrance of the embassy. People moved back into the lobby to hear the Ambassador read the long Independence Day speech. School children sang patriotic songs and "Namaste" and "Jai Hind" greetings were exchanged. Snacks (*samosa, laddu, paneer tikka*) were consumed and drinks (*lassi*, Cola, water) were sipped.

As I stepped back on to Yasukuni Dori, the slow procession of rightists, peaceniks, demonstrators, police, pedestrians, tourists, the young and the old was continuing. I was happy about being able to attend the Independence Day ceremony but also humbled by the thought of how different the day probably felt to the people around me and how it was Mountbatten's memory of one August 15th so many years ago that had brought us together. ■

How Ford's Marketing Campaign

Using Social Media for the Fiesta Broke Traditional Norms

- Shoubhik Pal

It is so unusual to think of how different marketing was before the dot com bubble and people's growing dependence in the Internet. Around a decade back, marketing was limited to predominantly billboards and TV advertisements. If your ad was in the World Cup, Super Bowl or Wimbledon final, you were guaranteed a huge audience to see your product. If you wanted to express your satisfaction over a product as a consumer, the only way you could back then was through physical word-of-mouth. The rules of the game have changed since then, and the emergence of the Internet has a huge part to play in this. You see adverts more frequently when you visit popular websites rather than when you drive about and see billboards or watch TV. Social media, in particular, has become a potent marketing device and the success story of Ford's campaign in the United States for the Fiesta back in 2009 attests to this.

The Fiesta was a subcompact car which had a lot of success in Europe before Ford decided to bring it to America. Back then, economic conditions were terrible, leading to higher sales in fuel-efficient subcompact cars. However, there were many barriers to Fiesta's success. The image of Ford's usual cars in the US before the emergence of the Fiesta was that of a gas-guzzler. Ford excelled in the pick-up truck market, but it was chartering unsuccessful territory in the subcompact sector. Back in 1994, Ford had released its first subcompact, the Aspire. However, it wasn't a profitable venture and Ford had to scrap it 3 years later. Ford also realized that there was no way the Fiesta would appeal to Ford's ideal customer: middle-aged families who drove pick-ups. With the Fiesta, they were appealing to a segment called the 'millenials'. 'Millenials' were youngsters who lived in urban conditions, were tech-savvy and needed an economic option in a car in terms of mileage, features, price, etc. Ford's existing advertising techniques would not work because the Fiesta was appealing to a totally different consumer group. Another big barrier for the Fiesta to break into the market was that Toyota and Honda were dominating the subcompact car segment, and since they were Japanese brands, consumer confidence in their product was high. Despite this, the Fiesta Movement was an overwhelming success.

The first thing your marketing professor teaches you is that every form of advertising, whether billboards, ads or social media campaigns, is useless if the product itself is defective. Thankfully for Ford, the Fiesta had a lot of consumer approval in Europe where it had carved a niche for itself. Therefore, Ford was extremely confident with this product's functionality. Ford used the help of digital strategy firm Undercurrent, and they developed the Fiesta Movement together. One of the key features of this campaign that set it apart was that they used predominantly social media to market their product, making the cost of it substantially less than other campaigns.

So what did the Fiesta Movement consist of? A year before its official release in the US, Ford manufactured a 100 Fiestas in the US. It created a website consisting of applications, and looked for 'agents' to drive it for 6 months. They wanted these 'agents' themselves to be part of the 'millenial' group they were looking to target, because there is a tendency to heed to someone's opinion if they are similar to you. These agents had to be tech-savvy as well as socially active, so that their opinions would reach a wide audience. YouTube stars with popular channels, budding musicians, people having a huge Twitter following or comedians with individual websites/blogs were all considered as agents. Ford had a 6 month period for incoming applications. More than 4,000 applications came during this time, and a 100 diverse 'agents' were chosen.

These agents were each given a Fiesta for 6 months and told to blog about it to create outreach. Every month, a different theme was provided by Ford, making the agents invested in the Fiesta. Every week or so, they were asked to do a different task. Art designers were asked to make wallpaper for the Fiesta, budding musicians were told to make music videos incorporating the Fiesta, and voyeurs were given treasure hunts using a map, taking them to beautiful, picturesque places. A great aspect about this campaign was that there was high interactivity, with the agents not feeling that these tasks were a burden. Many of them blogged and spoke about the Fiesta using various social media outlets such as Facebook, Twitter, YouTube, and gave videos for Ford to post in the Fiesta Movement page. This created immense anticipation for the product, with 6.5 million YouTube views to complement 11 million social media impressions and 50,000 inquiries about the Fiesta. When the car finally came out to the public, it sold 10,000 units in the first six days. Breaking into the market almost immediately, the Ford Fiesta became an overnight success story in terms of sales. Most of this work was done through the help of the excitement these 'agents' had generated about the product.

Ford deserves a lot of credit for this campaign because it took a lot of risk on their part. They gave full creative control to these agents and had no say in what the reaction would be for their product. Had the Fiesta been a faulty car, the agents would express their dismay. Had the car broke down regularly or been used for illicit activities, Ford would have a lot of bad press in their hands. However, Ford had immense confidence in the Fiesta and it showed, with practically no negativity from any of these 100 agents. Ford's Fiesta Movement broke new grounds in advertising as it didn't use any of the traditional methods to promote its product. It had confidence that its product would be accepted and that's what ended up happening. The Fiesta Movement also used a small proportion of money compared to the expansive ad campaigns we see in TV nowadays (the Vodafone Zoozoos, Ronald McDonald, etc.) and still got the job done.

It wouldn't be erroneous to state that the Fiesta Movement opened up an entirely new area of marketing that many marketers weren't aware was present. Social media has now become a powerful tool in promoting your product. While very few advertising campaigns nowadays base their entire outreach on social media like the Fiesta Movement, a lot of campaigns have it as one of their many components. Social media brings about a greater outreach and more interactivity. For the Ford Fiesta, it worked wonders. In fact, Ford is employing the same exact strategy for the new model of the Fiesta after immense success the first time round. ■

Our Okinawa Trip

- Purnima Ghosh

We visited Okinawa in March 2013. We went there not to recollect the horror of the World War II, but to explore the Okinawa's rich culture. Although we visited many places in Naha and Northern Okinawa during our trip, we focused mainly on exploration of both the Shuri Castle, known for the Ryukyu culture that ultimately gave birth to the modern Okinawan culture, and the Ryukyu Mura, which is the model of about 200 year old Ryukyu village. In addition to these, we also concentrated on both the Amida Buddha Temple, and the Chinese Garden, located near the International Street of the Naha City. Our emphasis was to figure out why the Okinawan culture so special.

We covered the Shuri Castle and the most of the Naha city, either by monorail or on foot. However, we took a tour bus for travelling around the northern Okinawa. During our trip, we put our best effort to mingle with the local people and to experience the true Okinawa and its culture.

Our cultural exploration started indeed at our Hotel itself. While interacting with the hotel staff, we recognized that Okinawa has its own language that was evolved mainly out of Japanese, and Chinese language due to their close interaction with the East and Southeast Asian people in the olden days as Ryukyu kingdom was an important trading center. Although Okinawan language is at present not widely spoken, Okinawa people are proud of their language as it is attached to their rich culture and heritage.

At the 14th century Shuri Castle, which was destroyed completely at the battle of Okinawa in 1945 but restored in 1992, we found that it was not a mere castle. It was the home of the Ryukyu king as well as all kinds of administrative, business and cultural center of the Ryukyu kingdom. The magnificent structure, decoration and artwork of the restored castle bear the profound imprint of Chinese and Japanese Culture.

The dance drama that was performed in the style of century old tradition of Ryukyu culture, confirmed how splendid the ancient Ryukyu performance art was. Indeed, the brilliant costume and gesture of the players made the event wonderful.

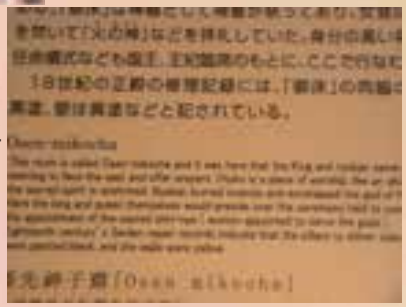

In the Shuri Castle, the role of woman was found admirable. From the various displays and signs, it appears that Ryukyu people had a strong belief in the sacred sprit and the God. In every religious event, woman played an important leading role. In the Castle, there is an area called 'Osenmikocha' where the king and his female attendants used to pray every day in the morning for peace and prosperity for everyone in the kingdom.

At the Usasuka of the Shuri Castle, we found the king's throne. It is widest at the top and bottom and narrowest in the middle. This configuration of the throne is commonly found in the Buddhist Temple. It clearly shows the influence of Buddhism in the kingdom in that era.

Although the Shuri Castle stands as a testimony of Ryukyu culture, most of the details provided at the castle are related to the lifestyle of king and his associates only. It, however, does not provide enough details of the common people and their lifestyle. In contrast, Ryukyu Mura that we covered as a part of bus tour of the Northern Okinawa highlights the lifestyle of the common rural people and the folk culture. We could get ample opportunity there to witness the 200 year old village. We could see various kinds of old houses, sugar factory, water mill, traditional Okinawan pottery etc. We saw many habu snakes there. Interestingly, we observed that the Ryukyu Mura staff members wore old style costumes while demonstrating the rural activities such as extracting sugarcane juice etc. It helped a lot in experiencing about 200 year old Okinawan folk tradition. As this Ryukyu Mura demonstrates the rural system before the American Occupation, we could not find any American influence in that culture. However, we felt that ancient Ryukyu folk culture was somewhat rested on the East and Southeast Asia style and customs.

The influence of both the Buddhism and the Chinese system on Ryukyu culture as well as Okinawan Culture is further confirmed by the existence of the Amida Buddha Temple and the Chinese Garden in the Naha City. Amida Buddha is believed to be an embodiment of enlightenment, compassion and wisdom. At the Amida Buddha temple, we found a grand prayer hall. During our visit, it was under renovation.

At the Chinese Garden, we found, a beautiful garden pond, fountain, fish, turtles, etc. in addition to the various kinds of plants. We were explained by the Garden Staff that the Chinese style was maintained in every part of the garden and it was built as a symbol of close relationship between the Ryukyu Kingdom and China.

Overall, from our trip to Okinawa, we realize that Okinawan culture which is originated from the Ryukyu culture is truly a mixed culture. Okinawa's ability to mix everything in right proportion and to create an 'Okinawan Chample' is its strength. It is, perhaps, the reason why Okinawan culture is so special. ■

Boarding the 'Superconducting Maglev Vehicle'

– the 'Linear Motor Car' in Japan

- Ashoke K. Karmokar

The Central Japan Railway Co. (JR Tokai) has announced on June 3, 2013 that the superconducting Maglev train, popularly called as 'Linear Motor Car' in Japan, would enter into the commercial operation in 2027 between Tokyo and Nagoya, and also the full Maglev train services would be ready by 2045 between Tokyo and Osaka. The first generation commercial Maglev train is set to transport passengers at a speed of 500km/h. Indeed, the revelation of the commercial operation of superconducting Maglev train was expected earlier after the prototype Maglev train 'MLX01' made the world record of 581km/h in 2003.

Being actively associated with a related research group in Japan, I could have the rarest of the rare chances of boarding the Maglev vehicle 'MLX01-901' in 2004 on Yamanashi Maglev Test Line at Tsuru, Yamanashi Prefecture. A senior member of Railway Technical Research Institute (RTRI) had arranged this protocol of boarding Maglev vehicle for our research group. It was on July 26, 2004, a normal summer day in Tokyo. A group of about 20 members were gathered at the JR Otsuki station, and then we all took a JR bus to reach the Yamanashi Maglev Test Center at Tsuru, Yamanashi Prefecture. I could well remember that the local climate was very hot and humid. The sky was cloudy and drizzling occasionally. A couple of local farmers were selling freshly cropped vegetables and fruits on the way to the entrance of the facility.

The Yamanashi Maglev Test Center authority had given us name tag and a welcome kit containing informative notes before entering into a meeting room at the facility. We were given a presentation on the general introduction and a short video of superconducting Maglev train systems being used at the Center was also shown. Precautionary measures and their implications on boarding Maglev vehicle were also explained carefully before proceeding to board the Maglev vehicle 'MLX01-901'. On the way, we could find a stationed 3-cars train through the rain-water washed wide-glass window. The prototype Maglev 'MLX01-901' vehicle was painted white with blue (greyish) stripes to resemble the company's Shinkansen trains, and in fact, not much difference were apparent at a first glance.

Almost the half of the front car constitutes a long streamlined and tapered nose (looks quite longer than Nozomi Superfast Shinkansen), seemingly to reduce air resistance at its high speed travel. However, there were no windshields because no driver was required for the train, and instead, a remotely located computer and camera on the nose control the train's operation as the senior RTRI member explained. The subsequent car mostly resembled like the Shinkansen car, though the windows looked smaller. Upon boarding, I could find that interior was nothing special but looked like Shinkansen. However, the Maglev train has four seats in a row, one less than Shinkansen models. My seat was in the window side, and thought myself lucky because I could have a view of outside through the window. Eventually, I took the seat allotted to me and looked out through the window. I could see a part of 'Guideway' which along with the vehicle's superconductive magnets help levitating and propelling the train. I was seated with full of curiosity to know the sequence of events those would follow one after another.

After a while, the announcement came and the train was all set for the run. Digits displaying speed at a panel set inside the car was showing '0' but it rocketed up to 500km/h within a very short time. Fantastic feeling, however, the amazing moments lasted only for a couple of seconds and then slowing down of the speed. The moment I shacked out for video clipping, the speed had already reduced to a level of 325km/h. Gradually the train reached to a standstill as it arrived at the other end of the test track which is 18.4km away from the point where we started. Almost immediately, the announcement came for the return journey. We remained seated there as facing forward, thus next journey was our backward run in the Maglev train. The return run was set to have a maximum speed of 400km/h, and this time I did not do mistake to take the video clipping of the panel. The recorded peak speed was 401km/h. Again, it was only a few exciting moments before we returned back to our starting point. At the exit, the authority had given each of us the Maglev Boarding Certificate as a record of our experience of boarding the 'Superconducting Maglev Vehicle' – the 'Linear Motor Car' in Japan. Altogether, I enjoyed the boarding moments and thereafter remained highly optimistic on the early commercial operation of the Maglev train services.

On June 3, 2013, journalists, fans and commoners got a chance of viewing a prototype of the first to be introduced as a model of the superfast L0 series Maglev train on its test track at Tsuru, Yamanashi Prefecture. JR Tokai is extending its experimental track in Yamanashi to 42.8 km from the present length of 18.4 km for starting full-fledged tests involving the new L0 series Maglev trains. According to the head of Yamanashi Maglev Test Center, the utmost aim is to bring the Maglev services with greater safety through extended tests though the vehicles are already safe enough for commercial service. Also, the authority would like to organize new round of meetings with local residents along the Maglev train line to explain the project including the progress in details on environmental assessments.

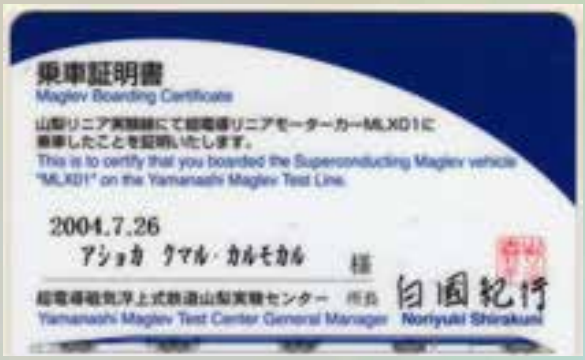
乗車証明書
Maglev Boarding Certificate
This is to certify that you boarded the Superconducting Maglev vehicle "MLX01" on the Yamanashi Maglev Test Line.
2004.7.26
様
Yamanashi Maglev Test Center General Manager Noriyuki Shirakuni

Maglev 'MLX01-901' train boarding certificate.

It is estimated that the service would make the one-way trip between Tokyo and Nagoya in as little as 40 minutes instead of current 100 minutes, and the full distance between Tokyo and Osaka in 67 minutes instead of current 2 hours and 25 minutes by Tokaido Shinkansen. Many have defined the superconducting Maglev train service as a new mode of transport for the 21st century, and no doubt, the announcement on commercial operations could be viewed as the first step toward that direction. In fact, this announcement had marked a milestone in almost its five decades of accumulated research and development efforts at the RTRI since 1962 for developing an ultrahigh-speed superconducting train. ■

Yen-Dollar Exchange Rate

- Sanjeev Gupta

I am often asked by my friends about my views on the foreign exchange rate – in particular the yen/dollar rate. Unfortunately, being no expert, there is very little value I can add. However, the following explanation on exchange rates may help readers. Although, exchange rates are largely determined by market forces, there are a number of explanations as to how the markets find the exchange rate.

Purchasing Power Parity (PPP) theory says a currency is only as strong as its purchasing power. So, if 100 yen and $1 buy one apple in Japan and the US, respectively, then 100 yen should trade for $1. Interest parity theory says that the country offering a higher rate of interest should be able to attract funds of other nations, and thus its currency should be stronger (i.e. one can buy more of others currencies at a lesser price). However, all these are oversimplified theories and the truth is there are several factors at work that influence the rate. The US dollar for example has been commanding a premium disproportionate to its economy's fundamentals thanks to its first mover advantage (as it is the preferred currency) and its "there is no other alternative" factor.

Other factors impacting the exchange rates are inflation (those countries with higher than average inflation see their exchange rate fall); trade surpluses/trade deficits (if a country is running a substantial trade surplus there is a large demand for the currency and, thus, its value should appreciate); political changes and market speculation. Recently, the power of market speculators has grown. Governments are having difficulty in offsetting the power of speculators because sovereign reserves of foreign currencies are very small compared to the daily turnover in the market.

As we know, the yen has fallen by 25% since its June 2012 peak. This fall is sharp, but not as sharp as the vertical rise subsequent to the bankruptcy of Lehman. So, let us ask ourselves what the key factors were, in this case, which led to the recent depreciation of the yen. It was mainly triggered by the political changes in Japan (victory of Mr. Abe at general elections) and the subsequent promise of the Bank of Japan to target 2% inflation. Given the difficulty in achieving this target, the recent yen/dollar rise to 100 seems to be the ceiling, and is unlikely to overshoot far beyond this level. ■

At Kanpur Station

- Udita Ghosh

The garb of invisibility
Suits me just fine.
If I could have one day for me
To slip away behind a screen -
    Oh, if one could pass the days
    Seeing but not being seen,
    Just as I now peer
Out the window of this train
From the Rajdhani carriage, watching
Men pushing loaded trolleys, calling out to each other,
Men separating waste, sleeping on the ground,
Another laborious day spent.
There is another kind of invisibility
That these men know well
That one can be seen, but not perceived
And only heard when they yell
-- the kind where ONE does not matter.
It's a number too small
In the swarm of one billion.

And growing.

Denizens of the Land of Rising Sun

- Tanushree Dutta

Their spirits never flounder
in any disaster.
Even in the worst melancholy
their hopes aren't shattered so easily.
Before their courage, that's boundless
fiascoes have to be faced by menace.
They do bend with gratitude
but nothing can break their fortitude.
Bravely they face each twist and turn.
They are the people of
The Land of Rising Sun.

The Monument of Love

- Soumitra Talukder

A monument beyond the horizon
of love, faith and glory!
Think of the Taj and we shiver in anticipated awe
as the creation even God seems to envy.
For how can a man who had the power
and all the wealth of world
still chose love as his destiny!
Or is it the charm of the lady, her poise
or her aura that inspired its entity.
Is it an hallucination to wish to love
or to be loved, to care
or to be cared it is just a vanity!
Have you ever felt
the essence of Taj in your heart,
the warmth of joy!
When you stand before it,
think of someone who is deep
in your heart,
salute the monument
for you can only leave behind our young
the clarity of love of truth.

Our 25th and some reflections

- Dipankar Dasgupta

As we reflect on our own lives
We see it as a jar full of joys and strive
We feel blessed and thank our fate
And pray for the less fortunate

We have learnt to accept life
In it various colours and stripes
Living in it, and on its fringes
Embracing its rewards and new challenges

On the way we made many friends
Some true and others part of the trend
Those who love only to bask in your sun
And some willing to share your sorrow and fun

There have been days full of glee
When we felt like birds flying free
Yet there have been very long nights
When life appeared drifting out of sight

Through agony and a lot of heartache
Ego is what we learnt to shake
Sometimes there is no right or wrong
It is all about singing the same song

A single word can change the mood
Immaterial, what was said or understood
To get the day back on the rise
One has to learn to compromise

With all its pain and agony
And days full of unbearable symphony
The beauty is in the sharing
That two lives can only offer in a pairing

तीन का चक्कर

- चम्पा तिवारी

"तीन तिरकट महा विकट", 'तीन' का अंक एक विकट अंक है। यह मनुष्य समाज व देश को ही नहीं पूरे ब्रह्माण्ड को अपने चक्कर में घुमाये है। कहीं "तीन तिगाड़े काम बिगाड़े" कह कर इसकी निन्दा की जाती है तो दूसरी ओर "तिरबच्चा दाम सच्चा" कह कर इसकी स्तुति कर प्रश्नों का हल निकाला जाता है। कोई प्रक्रिया आरम्भ करनी हो तो एक दो 'तीन' कह कर प्रक्रिया शुरु की जाती है। वहीं कहीं किसी काम का अंत करना होता है या रोकना होता है तो एक दो तीन बोल कर बस काम रोक दिया जाता है।

यदि चारों ओर विहंगम दृष्टि डालें तो तीन ही तीन चीज़ें दृष्टिगत होती हैं त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिदान, त्रियज्ञ, त्ररिस, त्रिगुण, त्रिशक्ति, त्रिमार्ग, तीन नरक के द्वार, तीन शरीर की अवधान, तीन काल, तीन मात्राएँ, तीन कर्म आदि आदि।

वास्तव में त्रिगुण शक्ति की ब्रह्माण्ड में बड़ी महत्ता है। सत्व, रज, और तम इन तीनों गुणों से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। प्रत्येक गुण के अनुसार देवता, सृष्टि, तप, कर्म, यज्ञ, दान होते हैं।

निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक तप कहलाता है। जो तप सत्कार मान सम्मान, स्वार्थ लाभ, बढ़ाई और यश के लिये किया जाता है उसे राजसिक तप की संज्ञा दी जाती है। जो तप हठ मन, वाणी और शरीर को कष्ट देकर दूसरों के अनिष्ट के लिए किया जाता है वो तामसिक तप है। यानि की तपस्या को भी तीन के घेरे में रहना पड़ता है।

'दान' भी तीन के चक्कर में है। जो दान उचित समय में, उचित पात्र को उचित कार्य के लिए दिया जाता है वो सात्विक दान है। जो किसी निश्चित प्रयोजन, यश, स्वार्थ व लाभ की दृष्टि से निश्चित पात्र को दिया जाता है वह राजसिक दान कहलाता है। जो दान अनिच्छा से, बल प्रयोग से तिरस्कार से आयोग्य स्थान और पात्र को अयोग्य तरीके से दिया जाता है, वो तामसिक दान की श्रेणी में आता है।

पूजा के ईष्ट व यज्ञादि कर्म के भी तीन प्रकार होते हैं। जो जप तप, अनुष्ठान कामना रहित अनन्त की शक्ति के अभाव व श्रद्धायुत होने से किये जाते है जो अपने ईष्ट देव की याद दिलाते है वो पूजा सात्विक व वह अनुष्ठान सात्विक यज्ञ कहा जाता है। जो आडम्बर, दिखावे व इच्छपूर्ति के लिए जप तप और अनुष्ठान पृथक पृथक देवी शक्तियों के लिये की जाती है जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि वो राजसिक पूजा व वो अनुष्ठान राजसिक यज्ञ कहे जाते हैं। किसी की विजय के निमित्त, वर्षा के निमित्त जो यज्ञ किये जाते है वो सब राजसिक यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। जो विधिहीन, दान, दक्षिणा श्रद्धाहीन सिर्फ कामना पूर्ति के लिए गंधर्वों, राक्षसों(नरसिंह आदि) की पूजा शत्रुनाश आदि के लिए अनुष्ठान किये जाते वो तामसिक यज्ञ व पूजा के नाम से जाने जाते हैं।

त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर मानव स्वभाव, आहार आदि निर्देशित होता है। स्वास्थ्य वर्धक रसीले, बुद्धिबल बढ़ाने वाले आहार सात्विक व्यक्ति की पसंद रहती है। कड़वे तीखे खट्टे तेज़ नमक मिर्च मसाला युक्त व्यंजन राजसिक व्यक्ति की पसंद होती है। रस रहित, अधपका गंधयुक्त बांसी और जूठा आहार तामसिक प्रवृति के लोग खुशी से खाते हैं। यहाँ भी तीन अपना घर बनाये बैठा है।

सृष्टि के सृजन के विषय में तीन मनतव्य प्रसिद्ध है। (1) आरम्भवाद (2) परमाणुवाद (3) विर्वतवाद। परमात्मा निमित्त कारण के रुप में बिखरे हुए परमाणुओं को संयुक्त करने लगता है। परमाणुओं के संयोग से नाना प्रकार की सृष्टि होने लगती है, उसे आरम्भवाद कहते हैं। परमाणुओं के रूप में भूत, आकाश, काल(समय) दिशा, आत्मा, मन ये नित्य द्रव्य हैं। इसके अतिरिक्त गुण, कर्म सामान्य विशेष पदार्थ भी हैं। यह मत न्याय और वैशेषिक दर्शन का है। योग दर्शन सृष्टि का कारण सृष्टि की त्रिगुणात्मक प्रकृति को मानता है। परिणाम प्रकृति का स्वभाव है। वेदांती शंकराचार्य विर्वतवाद को सृष्टि की व्यवस्था मानते हैं। यही नहीं सृष्टा (बनाने वाला) सृष्टि (बनायी गयी वस्तु) भी 'तीन' से अछूटे नहीं हैं। सृष्टा (ईश्वर) सृष्टि (प्रकृति और ब्रहमाण्ड के जीव, संसार) सृज्य (मानव, जल थल नभ के जीव जन्तु, पेड़ पौधे)। सृष्टि क्रम भी तीन अवस्थाओं में होता है समाज, देश, विश्व में रजोगुण प्रधानता से सृष्टि होती है। सतोगुण की प्रधानता में संचालन तथा तमोगुण की प्रधानता से प्रलय होता है।

परमात्मा का स्वरूप भी त्रिगुणात्मक है- सत, चित, आनन्द। ओंकार में भी तीन (अ, उ, म) ऊँम। सत शक्ति से कर्म लीला होती है, चित्त शक्ति से ज्ञान लीला और आनन्द शक्ति से विहार लीला सम्पन्न होती है।

तीन देवता ही मुख्य माने गये है। ब्रहमा (सृष्टि करता) विष्णु (पलन करता) और महेश (प्रलय करता)। इन्हीं तीनों की शक्तियाँ भी तीन है, ब्रहमा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, महेश की शक्ति पार्वती। इन शक्तियों के रहस्य भी तीन कहे गये हैं। (1) प्राधानिक रहस्यम (2) वैकृतिक रहस्यम (3) मूर्ति रहस्यम। शक्तियों की उत्पत्ति के रहस्य जानकर उपासना की जाती है। शक्ति उपासना या पाठ में भी प्रथम तीन सोपान प्रारम्भ करने से पहले अनिवार्य माने गये हैं। पहला देवी कवचम, दूसरा अर्गना स्तोत्रम तृतीय कीलकस्तोत्रम, ये तीनों सोपान या स्त्रोत्र दुर्गा स्पतसति साधना के मुख्य अंग हैं।

मानव की शरीरिक प्रवृति त्रिगुणात्मक है। बात, पित्त, कॅफ- तीनों के उचित तालमेल से पार्थिव शरीर पुष्ट रहता है। किसी एक की प्रधानता व न्यूनता से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेद इसी पद्धति से रोगों का निदान करता है। ब्रहमाण्ड के लोक भी तीन कहे गये हैं। श्रीमद् भागवत में तीन प्रकार की स्थिती (लोक)

बताये गये हैं - पृथ्वी लोक, उधर्व लोक तथा अधोलोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल। आनंद व दुख के आधार पर भी लोक तीन है स्वर्ग लोक (सुख और आनंद), मृत्यु लोक (सुख और दु:ख), नरकलोक (दु:ख और यातना)। योनियाँ भी तीन मानी गई हैं देव, मनुष्य, राक्षसी। स्थान भी तीन निश्चित है जल (पानी), थल (धरती), नभ (आकाश)। इन्हीं के रहने वाले भी तीन तरह के प्राणी जीव जन्तु वनस्पति होती है। जलचर जल में रहने वाले, थलचर पृथ्वी पर रहने वाले, नभचर नभ में रहने वाले। इसी के साथ ही यातायात के साधन भी तीन तरह के हो गये धरतीयान, वायुयान, जलयान। मोटर, गाड़ी, रेल आदि धरती में, हवा में चलने वाले हवाईजहाज़, पैराङ्रूप, हेलीकॉप्टर, आदि वायुयान, तथा पोत, नाव आदि जलयान हुए।

मानव के शारीरिक बनावट में नाड़ियाँ भी तीन मुख्य है- ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य में सबसे बड़ी नाड़ी है। इसी नाड़ी के मूल में कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह घेरा बाँधे बैठी है। इसी के दायें बायें समानान्तर ईड़ा व पिंगला नाड़ियाँ है जो सम्पूर्ण शरीर की नाड़ियों का संचालन करती है। योगी जन इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

मनुष्य के निश्चयात्मक शक्ति को 'बुद्धि' कहा जाता है। मोटे तौर पर ये भी तीन प्रकार की होती है। पिछली बात को पुन: याद कर पाना स्मृति है। भूत को स्मरण रखना स्मृति बुद्धि है। भविष्य के लिये अच्छाई बुराई सोच सकने वाली को 'मति' या मतिबुद्धि कहते हैं। तात्कालिक निर्णय, सोच विचार सही यह पुष्ट विचार रखती है, इसे बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि या प्रवृति मोक्ष और बन्धन को यथार्त मानती है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। जो वृति अधर्म को समयानुसार यथार्त मानती है वह राजसिक बुद्धि है। जो वृति अधर्म को ही सच मानती है वो राक्षसी वृति तामसी बुद्धि के रूप में जानी जाती है। यानी बुद्धि भी तीन के साथ अपना अटूट सम्बन्ध जोड़े है। काल भी तीन है भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल। बीता समय भूत, जो चल रहा है वो वर्तमान तथा आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। भूत की याद वर्तमान का संघर्ष तथा भविष्य की चिंता यही जीवन है। सिर्फ ईश्वर को ही 'त्रिकालज्ञ', कहा जाता है जो तीनों कालों के बारे में जानता है।

शक्तियाँ भी मानव की तीन है। विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। विचार शक्ति के द्वारा तर्क और चिन्तन किया जाता है, भावना शक्ति के द्वारा भावों (प्रेम, स्नेह, घृणा) का अनुभव किया जाता है, और कर्म शक्ति के द्वारा कार्यरत होता है। विचार से वस्तु को जानता है भाव शक्ति से उसको मानता है और कर्म शक्ति से कार्यरत होता है। जब तीनों शक्तियों को ईश्वरोमुख कर देते है तो प्रथम ज्ञानयोगी, दूसरा भक्तयोगी, तीसरा कर्मयोगी हो जाता है। कर्म करने वाले को कर्ता जिन साधनों से काम किया जाता है उसे कारण और करने की प्रक्रिया को क्रिया कहते है। ज्ञान ज्ञात ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। जानने वाला ज्ञाता, जिस माध्यम से जाना जाता है ज्ञान और जानने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। यानी ज्ञान और योग भी तीन के चक्कर में है। ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग भी तीन है- ज्ञानमार्ग भक्तिमार्ग और कर्ममार्ग। एक दृष्टि से कर्म भी तीन तरह के माने गये हैं। जो अभी वर्तमान में किये जाते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। वर्तमान से पहले किये गये कर्म तथा पूर्व जन्म के कर्मों को "संचित कर्म" तथा संचित कर्मों का फल जो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आते हैं उनको "प्रारब्ध" या भाग्य कहा जाता है। विचार भाव और कर्म इन तीन शक्तियों को अपनी परिपक्वता के लिये और तीन चीज़ों की आवश्यकता है- वे हैं पवित्रता, एकाग्रता व सामंजसय। इनके अभाव में कोई विचार भाव व कर्म पूर्ण नहीं होता। इसी से कहते हैं "अधूरी तपस्या जिय की काल ।"

जीवन यात्रा के भी तीन मुख्य पड़ाव हैं- जन्म, पालन, मृत्यु। मनुष्य की अवस्थाएँ भी तीन है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, समाज की ईकाईयाँ भी तीन बालक, युवा और वृद्धा। व्यक्ति जीवन की तीन अवस्था जागृत, स्वपन और सुसुप्ति में व्यतीत करता है। सबसे अधिक पूजनीय भी तीन लोग कहे गए हैं मात, पिता और गुरु। परिवार की मुख्य ईकाई भी पति, पत्नी और संतान भी तीन ही हैं। मुख्य ग्रंथ भी तीन हैं- (ग्रंन्थत्रयी) गीत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। 'वेद' ज्ञान के स्रोत भी मुख्य तीन हैं मृग, यजुर और साम। दिन के पहर भी तीन हैं- सुबह, दोपहर और शाम। सेवा व कर्म भी तीन तरह से की जाती है तन, मन, धन से। पवित्रता व सत्यता भी तीन तरह की है मनसा, वाच, कर्मणा। संध्या या पूजन भी तीन बार की जाती है जिसे त्रिसन्ध्या कहते हैं। गाँधी जी के बन्दर भी 'तीन' चीज़ों का संदेश देते है "बुरा मत देख, बुरा मत सुन, बुरा मत बोल। आकाश में 'तीन' मुख्य है सूरज, चँदा, तारे। प्रकृति व मानव जीवन में भी तीन सोपान होते होते हैं आदि, मध्य, अवसान। फूल में कली आती है, फूल खिलते है फिर मुर्झा कर गिर जाते है। इसी तरह भाव भी जागृत होता है, फिर उसे अपने आगोश में भरता है, अंत में लुप्त हो जाता है। मात्राएँ भी तीन ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। इन्हीं मात्राओं के उच्चारण से शब्दबोध होता है। सब जगह तीन का ही बोल बाला है।

संक्षिप्त में यदि यह कहें 'तीन" के अंक की महिमा धरती से लेकर आकाश तक, जल से थल तक, भौतिक ज्ञान से आध्यात्म ज्ञान तक, तन से लेकर मन तक, शरीर से लेकर आत्मा तक,आदि से लेकर अवसान तक अपना अखण्ड साम्राज्य फैलाये हुए है। जैसा कवि विहारी ने प्रेम के लिए कहा था वैसे ही हम अंक तीन के लिए कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी

इस अदभुद अंक तीन की
गति समझे नहीं कोय
ज्यों ज्यों में अंतर में चलें
त्यों त्यों बढ़ती होय।

हमें तो 'तीन" की तिकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो हम भी ढाक के "तीन पात" बनकर रह जायेंगे। हम तो तीन को विकट कहें न सच्चा, बस यहीं कहें कि यह सबसे अच्छा.। ■

अतिथी

-शुक्ला चौधुरी

उस बार कोलकाता मे ज़ोरों की गर्मी पड़ी थी। सुबह के नौ दस बजते ही सूरज का ताप बहुत तेज़ हो जाता था। एक दिन जब प्रात:काल मैं अपने सहेलियों के साथ भ्रमण कर के घर लौटी, घर के रसोईघर से कुछ आवाज़ सुनाई दी और घर के पीछे के खिड़की से भी कुछ बच्चों का शोर आ रहा था। पहले तो मैं यह सोच कर डर गई की कोई चोर घर में घुस गया है। मगर साहस जुटा कर वहाँ पहुँची, तो चौंक गई, देखा रसोईघर में चिमनी के खाली जगह जहाँ से धुँआ बाहर निकलता है वहाँ से एक बड़ा सा सफेद उल्लू घर के भीतर आकर बैठा हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक मैं वहीं एक जगह स्थिर होकर खड़ी रही और उस उल्लू को एकटक देखती रही। कितना सुंदर, स्वच्छ, और उज्जवल सफेद रंग का उल्लू था। इतना सुंदर उल्लू, मैंनें जीवन में कभी नहीं देखा था, इतना सफेद जैसे दूध का धुला हुआ हो, इसलिये देखकर दंग रह गई। बड़ी -बड़ी, गोल गोल, काली काली आँखें, मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मुझसे बातें कर रहा हो।

कितने ही प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, अगर कोई मनुष्य होता तो पूछ लेती मगर उस उल्लूक से मैं पूछूँ तो क्या और कैसे पूछूँ। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यक्ता है क्या व्गैरह व्गैरह। मुझे लग रहा था जैसे मेरे घर में कोई अतिथी आया है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। रोज़ शाम को वह कहीं उड़ जाता और सुबह होते ही वापस लौट कर मेरे घर चला आता। फिर पूरा दिन शांति से सोता रहता था। कभी कभी बैठे बैठे इधर उधर चारों ओर देखता रहता। मैं रोज़ धीरे से उसके सामने एक कटोरी में कुछ फल और सब्ज़ी के टुकड़े देती और एक कटोरी में पानी दे देती, जब उसका मन करता वह खा लेता।

उल्लू को लक्ष्मी देवी का वाहन माना जाता है, जो अर्थ और वैभव की देवी है। जिस घर जाती है वहाँ धन सम्पत्ति ले कर आती है। इसीलिए उस दिन जब मैंने अपने घर में उल्लू को देखा, मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। कई देशों में सफेद उल्लू को अशुभ या अलक्ष्मी भी मानते हैं। क्योंकि वह रातभर जागकर दिनभर सोता है। मगर हमारे बंगाल में उसे बहुत शुभ मानते हैं, जो रातभर लक्ष्मी के साथ घुमता है। मनुष्य को यही सीख देता है कि सामयिक हार और कष्ट से उसे घबराना नहीं चाहिये। रात के बाद ही दिन आता है, अगर मन में सच्ची लगन हो तो दु:ख के दिन दूर होकर सुख के दिन जरूर आते हैं। दूसरी ओर यह सिखाता है कि अगर मनुष्य को धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य चाहिए तो तीव्र मस्तिष्क से अपना लाभ खींचकर अपनी ओर लाना चाहिए। उल्लू जैसे रातभर जगकर दिनभर आराम करता है, वैसे ही मनुष्य को अंधकार से ना घबराकर उजाले की अर्थात ऐश्वर्य और सम्पन्न्ता की कूँजी अंधेरे में मतलब दु:ख दर्द में ही तलाश करनी चाहिए।

कुछ दिनों के बाद जब मैं सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रही थी वहाँ से वही बच्चे स्कूल के लिये निकल रहे थे। मैंने उनसे पूछा "तुम उस दिन मेरे घर के पीछे क्या कर रहे थे, क्यों इतना शोर मचा रहे थे ।" उन्होंने बताया कि उन्हें एक सफेद उल्लू दिखा था जिसे वे पकड़ने कि कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ खड़ी एक महिला बोली कि कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था की सफेद प्रजाति के उल्लू की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, इसलिए अगर किसी को मिले और सरकार को खबर दे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। तब मुझे मालूम हुआ कि जब सभी उस उल्लू को पकड़ने के लिए भाग रहे थे वह प्राण बचाकर मेरे घर में घुस गया। जब वह मेरी शरण में आया है, तो उसके प्राणों की रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है इसलिये मुझे उसे बचाने के लिये कुछ करना था। फिर बाहर निकलने पर यदि कोई उसे पकडने की कोशिश में उसे आघत करे, यही सोचकर दूसरे दिन सवेरे उठकर मैंने चिड़ियाघर के लोगों को फ़ोन पर सब वृतांत बताया और उन्हें आने का निवेदन किया। उस दिन दोपहर में वे एक पिंजरा और पशु-पक्षी के डॉक्टर को साथ में लेकर आए। वह उल्लू तब भी वहीं बैठा सो रहा था। उन्होंने धीरे से उसे पकड़ा और पिंजड़े में डाल कर ले गये।

मैं आज भी उस चिमनी को देखती हूँ तो मुझे उस अतिथी की बहुत याद आती है। कभी कभी चिड़ियाघर से फोन भी आता है उसका हालचाल बताने के लिये। मेरे मन को यही शांति है की उसकी अच्छे से देखरेख हो रही है और उसके प्राण सुरक्षित है। ■

बार बार मेरा आभार

- श्रीमती सुगताकुमारी, अंग्रेज़ी से भावानुवाद- सुरेश ऋतुपर्ण

आभारी हूँ रास्ते की कड़ी धूप की
और उस बोझ की भी
जो मेरे कन्धों को झुकाता रहा है,

आभारी हूँ छाया के उस नन्हें से टुकड़े की
जिसने मेरी राह को शीतल बनाया,
पेड़ की फुनगी पर कूकती
कोयल की कूक को भी मेरा आभार,
आभार उन नुकीले पत्थरों को
जिनकी चोट राहों में कसकती रही सदा,
आभार आग बरसाते सूरज का
और पत्थरों के उस ढेर का भी
जिस पर बोझा उतार
मेरा बटोही- मन सुस्ताता था।
उस कुंए का भी आभार
जिसका शीतल जल मेरी प्यास बुझाता था।

अपने मन की गहराईयों से-
मैं कहना चाहती हूँ-
मैं आप सबकी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ।

मेरी राह बेहद उदास और धुंधली थी
जिस पर छल-प्रपंच के गहरे गड्ढे थे
पर आभारी हूँ उन चांदनी रातों की
जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया
आभार देती हूँ इन सबको बार-बार।

कृतज्ञ हूँ राह किनारे मुस्कराते उस छोटे से फूल की
कृतज्ञ हूँ चिड़िया के कंपित स्वर में गाए गीत की
कृतज्ञ हूँ उन आँसुओं की जो कभी सूखे ही नहीं
कृतज्ञ हूँ करुणामयी अंत:सलिला की
जिसने कभी सूखने नहीं दिया मेरा जीवन।

चलती रही मैं खाली हाथ
अकेली और केवल अकेली
उस दीपक की ओर
जो किसी ने मेरे लिए जलाया और रखा अपनी हथेली पर।
अब मेरे पास
बचाने के लिए कुछ भी नहीं है शेष
और न पुकारने के लिए कोई अन्तिम शब्द,
न कोई खिलखिलाता फूल
न उगती सुबह,
कुछ भी तो नहीं है मेरे पास
बस एक अनुकम्पा भरी पुकार है
और है एक गीत
जिसे मन ही मन मैं गुनगुनाती हूँ।

ओ मेरे मित्र!
कुछ पल के लिए ठहर जाओ
तुमसे कहना चाहती हूँ कृतज्ञ मन से
बस एक बात कि तुम्हारी आभारी हूँ।
स्वीकार करो मेरा आभार।
ओ मेरे मीत!
करो स्वीकार
मेरा ये विनत आभार बार-बार।

एक अजनबी

- सारिका अगरवाल

कुछ पलों के लिये कोई आया
और चला गया,
कुछ हलचल सी हुई ज़िंदगी में,
हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन,
हमें बहुत कुछ सिखा गया।

हमारे हँसने की खनखनाहट में
बजता था वो,
हमारे बोलने के अहसास में
चहकता था वो,
हमारे जीवन में मधु बनकर
कब घुल गया वो।

हैरान थे की कभी उनके बिना
भी जिया करते थे हम,
एक दिन जब जुदा हुआ तो लगा
शरीर से प्राण निकल गया,
पर वक्त ने हमको
उसके बिना भी जीना सिखा दिया,
जो अहम था जीवन में
उसको आम बना दिया।

कभी कभी आज भी कुछ यादें
दिल पर दस्तक दे जाती हैं,
उनकी कुछ बातें लवों पर
मुस्कुराहटें ले आती हैं,
कब इतने अपने, बेगाने हो जाते हैं,
ज़िंदगी अपनी किताब से
क्या खूब सिखा जाती है।

मुस्कान

- सुमीता भट्टाचार्या

आज एक मुस्कान मिली...
नन्हे से एक गोल गुलाबी चेहरे पर,
होठों की रस्सी पर बैठी झूल रही थी
दो आँखों में नाच, कूद और खेल रही थी।

नज़र पड़ी मेरी जैसे ही,
उचक के मेरे पास आकर
खींच दिए कोने मेरे भी होठों के,
मेरे भी गालों पर उभरे
दो छोटे-छोटे टीले।
फिर शायद कोई और दिखा
दौड़ गई उससे मिलने।

आस-पास देखा तो पाया
औरों के चेहरों पर भी,
उसके कदमों के निशान
बाकि थे अब तक।

अमन बिक गया है

- सुनील शर्मा

आज क्या हो गया है इंसानियत को।
क्यूं फिर से बहाल अमन बिक गया है॥
क्यूं तोड़ा गया है उन खड़ी दीवारों को।
पीछे जिनके तूफानी सैलाब टिक गया है॥
कौमी इत्तहाद की तैयार कर के कब्र।
अब कौन खूनी तराना लिख गया है॥
वक्त की भेंट कर के यह घिनौना करम।
तारीख का कौन सा बहाना दिख गया है॥
चन्द लोगों के हाथों अपने मतलब के लिए॥
आज फिर से बहाल अमन बिक गया है॥
यह क्या हो गया है इन्सानियत को।
क्यूं फिर से बेहाल वतन हो गया है॥

はじめてのインド

－ 三橋裕子（みつはし　ゆうこ）

二年前の9月～10月にかけて、スワーミー・メーダサーナンダ・マハラージと共にインド巡礼の旅に参加いたしました。

私は3年前に病気で入院したことがあり、やりたいこと、行きたいところがあるなら、今行動をおこさないでいつやるのかという気持ちでした。
治療を終えて体調が落ち着いた頃より、「インドに行きたい」という想いだけが強くなり、そのことをマハラージに直接お伝えしたしました。
飛行機のチケットのこともあるので即答はできないと、なにより【あなたがインドに行く目的は何ですか？】と尋ねられました。
行きたいという気持ちだけが強く、改めて目的とは？と考えたことがなかったのです。
そこで「自分の足でインドに行って、自分の目で見てみたい。感じてみたい。」とお伝えしたところ、マハラージより【それなら観光で十分ですね】と言われました。
そのころの私はインド大使館でのバガヴァットギータの講話を受けておらず、本もあまり読んでいませんでした。思い返すと、マハラージに大変失礼なお願いをしていたと恥ずかしさと反省する気持ち、連れて行っていただけたことに心からの感謝を感じております。

初めてのインドは、到着したデリーの喧騒で、日本ではありえないパワフルさにまず驚きました。車間距離のなさ、クラクションの音、その中を平然と走るオートリクシャー
時差で日本だったら真夜中だと思いながらの遅めのお夕食をいただき、念願かなってインドに来ることができたことが、嬉しくてなかなか寝付けませんでした。

インドは力強くて、スケールが大きくて、人々が逞しくそしてチャーミングで素敵でした。日本だと大きな木は山や公園などに行かないとありませんが、インドで目にする風景には大きな木々がたくさんあり、緑色が濃く、空は青く、夕日の濃い朱色、人々の笑顔、大きな瞳、生きるパワーを感じ圧倒されました。

帰ってから福音を読み、連れて行っていただいた場所に想いを馳せました。
タクールが霊性の修業をなさった場所であるパンチャヴァティのバンニャンの木、マザーがおられたナハバト、コシポル・ガーデン、ウドボタンのマザーハウス、寺院もたくさん連れて行っていただきました。福音の中の世界に行くことができ、理解は後からですが、なんてすばらしい経験をさせていただいたことかと…感慨深い思いで、タクールの恩寵を感じております。
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダのお部屋を特別に見せていただいたときには、背中からザワザワと熱いものがこみあげてくる感じをうけ、涙が止まらなくなりました。聖地をまわっていた時に感動して立ち止まることはありましたが、涙が出たのは初めてです。
私のつたない表現ではお伝えしかねますが、その場の波動や見えない力のようなものを感じ、「この状態は何だろう？」と、なんで泣いているのかがわかりませんでした。
マハラージはすぐ気づいて下さり、【大丈夫ですか？】とお声をかけて下さいました。
私は涙が止まるまでの間、何も話せなくてガンガーをながめていました。
インドで泣いたのはその時だけです。
帰ってきて2年たちますが、あの時感じた不思議な《こみあげてくるような感情》は、残念ながら今は感じません。あの場所での出来事は今もって疑問ですし、私の宝物のような貴重な体験です。

福音の中でタクールがヨガについて語られていて、「バフタカはさまざまの聖地を訪ねてさまよい歩き、なおかつ心の平安を得ていない。しかしクティチャカは全ての聖地を訪ね終わって心安らかである。澄み切った平安を感じていて、一か所に落ち着き、もはや動き回ろうとはしない。どこに行こうという必要も感じない。」と言われていました。
私に関して言えば、病気をしなければ、思い切って参加しなかったと、そして（インドに行くと）行動を起こしたことで、私の内面は行く前と行った後で、大きく変わりました。
一番の変化は「穏やか」に感じることが増えました。
マハラージと協会の皆様との巡礼は有難い貴重な経験で、夢のような12日間でした。

ガンガーの聖水をペットボトルに入れてもらい日本に持って帰りました。
特別な時だけ使うようにして、まだ半分ぐらいのこっております。この猛暑のなか、自宅の祭壇においていますが、日本の川の水や水道水でも二年前のものなら藻が生えたり、にごったりまたは匂いがするかと思います。しかしガンガーの聖水はボトルに半分で、保管は常温で室内なのに、頂いたときのままです。特別な神秘的な力を感じます。

次の機会がありましたら、今度は福音や本を読んでから理解したうえで、インド巡礼に参加したい。どうかもう一度インドに行く機会が与えられますようにと願っています。

文章を書くことから遠ざかっていたので、投稿することをためらっておりました。
書いているうちに、漠然と「インドが大好きで憧れている」ことに気づかされました。
読みにくいところ、わかりにくいところがあったかと思いますが、読んで下さりありがとうございました。■

私のインドの人々との異文化体験きた

－日下明代

私が初めてプジャに参加させて頂いたのは、今から10年以上前からのことと思います。Mrs.アルピタ・ゴーシュさんからの招きを受けました。インドの祭りはどのようなのかしらとの興味と、異文化の体験をすると言うことで、わくわくしながら参加させていただきました。プジャに集まった女性・男性・子供たちの晴れの衣裳はとても豪華で、女性たちのゴールドのアクセサリーのまばゆさは、インドの人はゴールドがよく似合うとなおさらにして感じました。子供たちの演じる劇、踊り、歌などは日本の小学校の学芸会と同様に、インドも日本も変わらなくあどけなく、可愛いものでした。そしてインドより来日した舞踏家の踊りは、音楽、首、手足の、の動きの意味は、私にはまったくわかりませんが、プロの方々の美しい姿や衣裳には、感動を覚えました。

私が初めてインドの国の人と出会ったのは、今から16年ぐらい前の夕方でした。スーパーマーケットからの買い物の帰りに信号で止まった時、自転車からコロコロとリンゴが転がり落ちました。向かい側の道路にインド人の夫婦が道端に座っていたのです。そしてそのリンゴを拾ってくれました。その時の私の心の中は、エー、なぜ、なんで！私の家の近くにインドの人がいるの？それはそれは、不思議と驚きでいっぱいでした。日本人は欧米の人々は見慣れてはいますが、アーリア系の人々とは、大変珍しい出会いと思いました。その後、インドの人々とのお付き合いが始まりました。インドの人々の社宅は私の家の近くにあり、次から次へと新婚のカップルがその社宅に、インドよりやってきました。確かに一番多く社宅に住んでいた夫婦は、8組ぐらいだったと思います。それ故に私の生活は今までと違ってインドの人々との交流が多くなりました。私が最も親しくお付き合いを続けているのは、Mr.Raja.Ghoshさんの家族です。現在アルピタ・ゴーシュさんたちはアメリカのニュージャージー州に住んでいますが、月に1回は互いに連絡を取り合っています。アルピタさんをはじめとして、各々の室に招待されてインド料理や珍しいインドの文化を知らされました。もちろん、私の家にも皆さんに遊びに来てもらい、日本の習慣、生活、考え方などの話をしたものでした。或る夜、インドの1人の奥さんが体の不調を訴え私の友人の車で病院へ連れて行ったこともあり、又、内科、皮膚科、産科、大学病院、クリニックへと、診察、付き添いなどへと行くこともありました。以上のようなことを書きますと、相当英語が話すことができるのではないかと思われますが、私はそんなに英語は得意ではありませんですし、皆さんと交流するときは、いつも電子辞書をもちながら会話を続けたものでした。インドの人達と知り合ったことで、私はもっと英語を学ばなければならないと思いたった切っ掛けとなりました。インド人の方々との交流は私にとって、活気のある時を過ごしました。子供たちも英語を使う機会をもちました。日本の経済に陰りが見え始めたころ、少しずつインドの人達は、本国や他の国々に移っていく傾向が見え始め、3.11以降もっと加速したように思われます。品川から葛西の方面に移っていく人達も増えていきました。少し淋しさを感じましたが、今、現在でも付き合いを、続けています。

最後に、日本は戦前から戦後にかけて民間でのインドとの交流があったと言う事を、私の友人から聞きました。インド人のチャンドラ・ボースという方が、たくさんのインドの若者たちを民間で作った興亜同学院と言う名の学校で勉強をさせるために来日していたそうです。その友人のお父様が教師をなさったと言うお話を聞きました。日本は昔からインドの国とは友好があったのですね。私は、インドの人々と知り合いとなって友好が持てたことは、とても良い経験と喜びに満ちております。“ありがとう” ■

大柄で見るからに強そうな侍が、小柄な僧の元を訪ねました。侍は、いつも通り人を威圧するような声で、「坊主、私に天国と地獄について教えてくれ」と言いました。

僧は屈強な侍を一べつし、「お前に天国と地獄について教えろだと?」「お前に何も教えられないよ。お前は汚いだし、臭いし、お前の刀は錆びついておる。お前こそ、武士の恥というもんだ。不名誉だ。今すぐ私の目が届かないところに消えうせろ。お前に我慢ならんのだ」と完全に馬鹿にしたように返事をしました。

侍は激怒しました。驚きと憤怒で顔は真っ赤になり、ことばをも失いました。刀を抜き、僧に突き付け、今にも僧を殺めようとする寸前でした。

その時、僧は「それは地獄だ」と穏やかに言いました。

武士はこの小柄な僧の慈悲の心と我が身を省みない心に圧倒されました。自分に地獄を教えるために自ら命を投げ出したのです！武士はゆっくりと刀をおろしました。感謝の念に満たされ、そしてにわかに平安に満たされました。

「これこそ天国だ」と僧は静かに言いました。

バスの旅

– サモント恵理菜

私は今の会社に入社する前はよく都営バスの一日乗車券を使って新宿などに遊びに行っていました。500円払うと1日中都バスが乗り放題という券です。

バスは乗り換えが面倒ですが、交通費節約の為に、時間に余裕がある時は頑張ってバスだけで移動していました。

ところが、今の会社に入社してから時間に余裕がなり、定期も持っていたので電車ばかり使うようになりました。ところが最近、会社が自宅のすぐ近くにお引越しした為、定期も持たなくなり、更に時間にも余裕が出てきたのでまた昔のようにバスの一日乗車券を使うようになりました。

先日、バスにゆらゆらと揺られながらぼんやり乗っていた時、ふとインド（バンガロール）に留学していた時の事を思い出しました。

大学生活3年間のうち、2年間はオートリキシャで移動していましたが、大学生は人づきあいが多いのでお金がかかります。3年目は交通費節約の為にバスで移動するようになりました。

最初のきっかけはたまたまお財布を寮に忘れてしまった日があって、ポケットに5ルピーしかありませんでした。当時のオートリキシャの初乗り料金は10ルピーで、大学から寮までのバス料金は5ルピーだったので、バスで帰ることにしました。以前、友達と同じバスに乗ったことはありましたが、一人で乗るのは初めてだったので、ちょっとドキドキしました。いざ、行き先を告げると、女車掌さんは何と10ルピーを請求してきました。5ルピーでしょ？と言ったら驚いたことに、ワールドチケットだと言い張ったではありませんか！私は驚きと共に、困りましたが、めげずに5ルピーしかないというとあっさりしょうがないなーと5ルピーを受け取り、チケットをくれました。その日はなんで10ルピー請求されたのか不思議でたまらなかったのですが、どうも、外国人からいっぱい取ろうとしたみたいでした。でも、こんなびっくりな経験は一度だけでした。それ以降バスの安さに魅了され、私のメインの交通手段はバスになりました。

ところが、インドのバス停は日本のバス停のようにはっきりと看板（？）が立っていないところが非常に多く、バス停という事を示すものが無い＝どんなバスが止まるのか、どんなルートを通って行くのかも書いてありません。バス停の名前だけ書いてあることもあるのですが・・・バス停の数と比べると少ないです。なので、最初のうちはとりあえず終点のバスターミナルまで行って、そこで乗り換えていたのでとても時間がかかりました。何回もそれを繰り返しているうちにだんだんどのバスがどのルートを通るのか一通り覚えることができました。あと、バスターミナルで売っているルートマップも買いました！ただ、非常にわかりにくいのでやっぱり乗ってみないとわからないです。

それから、先ほど申し上げた通り、バス停という事を示すものが無いので、バス停の名前が分からない事も多いです。なので、バスに乗っている時は必ず車掌さんがなんて言っているのかに注目していました。バス停に着くと、車掌さんはよくバス停の名前を叫んでいるのです！なので、将来役に立つかもしれないという事でそれぞれのバス停の名前をインプットしていました。

更に！インドでもちゃんとあります！1日乗車券！1日あちこち行く予定がある日はOne day passを当時25ルピーで買っていました。時々、そのone day passに用が無くなった知らない人から譲り受けた事もありました。なので、私も用が済んだら時々人が良さそうな方に差し上げていました。

他にも、運賃に関して思い出が・・・

インドの方ならご存知だとは思うのですが、日本では信じられない事がたまに起こるのです！

ルート上、小さなバスターミナルを通る路線もあるのですが、時々、そのバスターミナルでランダムに乗客がきちんと切符を買ったかどうかチェックするみたいなのです。なので、出発地から目的地の間にバスターミナルを通るときはありえないのですが、たまに運賃の割引をしてくれるんです！但し、それは正規の割引運賃ではなく、切符をあげない代わりに運賃を安くしてくれるという手なんです。そして、切符を発行しないで手に入れたお金は車掌さんのお小遣いになるんです（笑）私も運賃を安くしてもらい、車掌さんもお小遣いが手に入り、お互いにメリットがあるので、やっているのでしょうね・・・最初はなんでいつもより安いんだろう・・・と思いましたが、切符をくれなかったので気が付きました。見つかったら大変なのでしょうが・・・今となっては良い思い出です（笑）

ただ、バスはやはり時間がかかります。だいたいバスが来る時間は大まかに決まってはいるみたいですが、はっきりした時刻表がないので、待つときは本当に待ちました。たまに、寮の門限に間に合うか心配になり、オートリキシャで帰ってしまったこともありました。それに、夕方のラッシュアワーはとにかくすごい人です！もう車内はムンムンしていて、大変でした！帰りだから汗かいてもいいやーと割り切っていましたが・・・でも、そのラッシュアワーにも思い出があるんです！荷物を持って立っていると、座っている人がご親切に「持ってあげるよー」とお声がけしてくれるのです。最初は大丈夫かなーと思ったのですが、一回も物を取られたことはありませんでした。（もちろん貴重品は預けませんでしたが・・・）

とにかく、バスに乗るみなさんって親切なんですよ！バス停でどのバスが○○（目的地）に行きますか？と尋ねるととにかく親身になって教えてくれます。

あと、1人だけ、若い女車掌さん（20代）がいたんです。その車掌さんはけっこう英語が上手な方で、よく喋りかけてくれました。なぜかその方は将来の夢や娘さんのお名前などを自分から教えてくれました。きっと、外国人の友達ができたような気分だったんでしょうね。インドではカーストシステムは法律で禁止されていますが、やっぱりカーストによってバリアみたいなものは残念ながらいまでも存在します。なので、インド人の中流階級〜お金持ちの方がバスの車掌さんと世間話するなんて考えられない事なので、友達に言ったらちょっとびっくりしていました。（女性の車掌さんでも、インド人女性はあまり喋らないかと思います。もっとも、女車掌さんもインド人女性に対して世間話しないかもしれません・・・あくまで外国人と喋りたかっただけかもしれませんね）。

まぁどんな事情であれ、私にとってはバスの中でのちょっとしたお友達でした。

まぁこんな感じで遠く離れた日本のバスの車内で思い出に入り浸っていました。

おしまい

パワーストーンが我が家にやってきた！

－辻　しのぶ

パワーストーンってご存知ですか？

古くから願い事を叶えたり、魔よけとして大事にされてきた天然石のことを称して、現代ではパワーストーンと呼ばれているようです。例えば、生まれ月毎に決まっている誕生石や水晶、アクセサリーに用いられる半貴石や貴石も、パワーストーンと呼ばれるもののひとつです。

パワーストーンは天然石のため、出来上がった過程もいろいろですから、同じ種類の石でも形や色がそれぞれ違います。中にはその過程で面白い内包物や、ちょっとした傷ができるものもあります。しかしそれぞれが独自のストーリーを持つ、パワーストーン。だからこそ、それぞれに不思議な力が働いていると言われているのでしょうか。

私がパワーストーンを初めて手に入れたのは、一年ほど前。

「よく当たる占い師」を友人に紹介され、都内近郊のお店に足を運んだ時のことでした。

そこはもともと天然石を扱うお店であり、「占い師」は実はお店のオーナー。

石を買いに来たお客さんにどんな石を持ったらいいのかをアドバイスしていたのが始まりで、そのアドバイスが「よく当たる占い」として口コミでだんだん広まっていったようです。

お店には、アクセサリー用に加工された色とりどりの天然石が華やかに並べられていました。なるほど、これはやはり何らかのアドバイスをもらわないと、どれを手に入れるべきか誰もが迷うことでしょう。

タロット占いの結果、その時の私に必要なパワーストーンは、ペリドットとユーディアライトだと教えてもらいました。

ペリドットは、淡いグリーンの涼やかな半貴石。こちらは私も見たことがありました。

暗闇に光をもたらし、ポジティブな力を授ける「太陽の石」と呼ばれるこの石は、8月の誕生石でもあります。

かたや、初めて見るユーディアライトは透明度の低い、黒に近いパープルの石。女性性を表し、愛情深い癒しの石だということ。「女性性」とはいうものの、ペリドットに比べるとずいぶんと地味な印象の石です。

パワーストーンはアクセサリーとして身につけたり、または置き石としていつも目の届くところに置いて眺めたりするとよいのだとか。せっかくなので、私もその二つの小さな石を手に入れることにしました。

ところが、実はアクセサリーが苦手な私。どうやって身につけようかと考えあぐねていると、お店の人が携帯のストラップに加工してくれました。様々な連絡や情報が入ってくる携帯につけておけば、悪い知らせを防ぎ、よい知らせがたくさん入ってくるようになるのだとか。今でも私の携帯には、グリーンとパープルの小さな石がぶら下がり、よいお知らせを呼ぼうと活躍してくれています。

「クリスタルの展示会をやるから来てね」と、旧知の友人に連絡をもらったのは今年の初夏のこと。以前から天然石を使ったヒーリングに興味があると言っていた彼女は、趣味が高じて、今では自分で海外から天然石を買い付けてくるようになっていました。

彼女のブログを見ると、扱うクリスタル（英語圏での生活が長かった彼女は、パワーストーンのことをこう呼びます）は、アクセサリーとして身につけるというよりは、原石をそのまま愛でる、といったほうがいい大きさの石でした。

昨年行ったお店にある天然石がアクセサリー用に加工されているのとは違い、かなりダイナミックで、写真からも何らかのパワーを感じるそのクリスタルたちをこの目で見てみたいと思い、今年は彼女の展示会にお邪魔することにしました。

店舗を持たない彼女が展示会のために借りたのは、自由が丘の駅にほど近いレンタル

スペースでした。商店街を通り抜けたところにある雑居ビルの2階のその部屋までは、駅からたった1、2分の場所にあるのに、猛暑のせいでたどり着いたときは滝のように汗が流れ出る始末。ようやく足を踏み入れたその部屋では、差し込んだ陽を全身に浴びてキラキラと輝いているたくさんのクリスタルが、汗だくの私を涼やかに出迎えてくれたのでした。

フランスやアメリカのアリゾナやツーソンまで行って買い付けてきたクリスタルは、写真で見るよりぐっと迫力がありました。ただ透明度が高いせいか圧迫感はなく、やさしくでんと構えている「肝っ玉かあさん」みたいな感じ。訪れるお客さんも、いろいろなクリスタルを手にとっては光にかざしてみたり、用意されていたお茶を飲みながらほかのお客さんと会話をしてみたりと、とてもアットホームな雰囲気でくつろいでいるように見えました。

1時間ほど悩んだ挙句、私はアメリカのテネシー産のフローライトとブラジル産の小さな水晶をつれて帰ることにしました。二つのクリスタルを、乾燥したセージの葉で浄化（石に溜まった悪いエネルギーを抜き、ゼロの状態に戻すこと）しながら友人は、「あとでこの石の意味を調べてみてごらん、今の自分に必要なものがわかると思うよ」と教えてくれました。

さっそく家に帰って調べてみると、フローライトには「無邪気な発想や思考力を高める」、水晶には「生命力を活性化させ免疫力を高める」というヒーリング効果があることがわかりました。

パワーストーンは願いを叶えるツールではなく、持つ人のモチベーションを上げたりパワーを大きくして、その結果願いが叶うよう手助けをしてくれる物なのだとか。パワーストーンを持つだけで安心、というわけではなく共に努力して結果を出す、というところが、なんとも真実味があるところです。

大事な役割を担うために我が家にやってきた二つのクリスタルは、昨年から家にやってきた二つのパワーストーンとともに、現在わが家のチェストの上で私を見守ってくれています。サポート要員が二人増えた今年、私はどう変われるのか。自分自身でもちょっとわくわくしています。

あ、もちろん私自身も頑張らなければいけませんね！ ■

わっこひろば宙からのメッセージ

－山田　さくら

わっこひろば宙で、子ども達を保育する仕事に携わっていてつくづく分かってきたのは、幼児の保育・育児に大げさな理論や過剰な技術・関わりは必要ないのではないかということだ。

宙の子ども達は、ほとんど人見知りがなく宙に初めて来た人や子どもに対しても友好的で、普段の生活が乱されるということがない。いつも自然体。

外に出れば、会った人には必ず声をかけている。私達大人が指図したことはないし、する必要性を感じたこともない。子ども達と育てる側の大人との信頼関係がしっかり出来ていれば、子ども達は自ずとすくすく育っていく‥ということが、目に見えてとてもわかりやすい環境でもある。

先日、ある方のエッセーを読んでいると、こんな一文が目に止まった‥

「介護の様子を見ると、その人がわかる。『そこまでしたら続きませんよ。もっと手をぬいて』と、つい声をかけるほど一生懸命の人がいる。一方で介護の達人は、ちょっと不謹慎ではないかと思うほど、楽しみながら世話をしている。子育てもきっと一緒だろう‥」

わっこひろば「宙」のバックボーンである楽しい子育ては、決して間違いではないと意を強くした。

✤　　✤　　✤

今年も田植え

有機肥料・無農薬の田んぼだからこそ、裸足で田植えが出来るし、泥泳ぎもOK！

9月に収獲したら、クッキング保育で試食する予定。

子ども達は、田植えに飽きたら、泥んこ遊び。そのうち着ているものを一枚一枚脱いでいき、最後は、土手のまわりを素っ裸で走り回っていました！原住民そらの裸族だ〜と、みんなで大笑い。

野外自然体験「千年の森」

約2時間ほど、森の中を探検。

急な坂も何のその。子ども達は元気いっぱい！木のツルでターザンになったり、木に登ったり‥

そして、途中の清流で思いきり水遊び！

大人にも子どもにも楽しさ満載の森の探検。

布を染めました！
クッキング保育の時にスカーフとして使っています。

掲載した写真はほんの一部ですが、宙の子ども達は、いろいろな体験をしながら育っている。

✤　　✤　　✤

それぞれの子供の顔・成長していく様子がよく見える宙の保育は、われわれ保育に携わっいる者にとって、しっかり楽しむことが出来る上に、元気なパワーももらえる。
繰り返すようだが、子育てに難しいものは要らない！
Open/Peaceful/Lovelyな場所でさえあればいい。そんなわっこひろば宙から、いろんな場所へステキなわたげを飛ばしたいと思っている。

わ　　た　　げ
大地に　足をふみしめて
わっこになって　花さかそ
大きな　大きな　花さかそ

宇宙（そら）にむかって　とばそうよ
わたげを　どんどん　とばそうよ
どんどん　どんどん　とばそうよ

仲間が　たくさん　ふえるよう
あしたが　笑顔になれるよう